সুসমন্বিত চাষ

মনের মতো চাষ। মনের মতো বাস।

BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

hoffnungszeichen
sign of hope

DRCSC

প্রথম প্রকাশ - **সেপ্টেম্বর ২০২১**

রচনা ও ভাবনা - **তাপস মন্ডল**

হরফ - **শিপ্রা দাস**

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসাজ - **অভিজিত দাস**

রেখাচিত্র - **মানবেন্দ্র পাল**

প্রকাশক
দিলীপ সরকার
ডি আর সি এস সি
৫৮এ ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা ৭০০ ০৪২
০৩৩৩ ২৪৪২ ৭৩১১ | ০৩৩ ২৪৪১ ১৬৪৬
drcsc.ind@gmail.com, www.drcsc.org

সহায়তায়
SoH | BMZ

কথামুখ

আমরা চাষ করি তাই খেতে পাই। কৃষক চাষ করে তাই তার দু-পয়সা রোজগার হয়। এইজন্য ধান চাষ হয়, গম চাষ হয়, আনাজপাতি হয়, পুকুরে মাছ হয়, হাঁস-মুরগি-গরু-ছাগল ইত্যাদি পালন করা হয়। তবে দিনে দিনে জমি কমছে, চাষের খরচ বাড়ছে, পরিবেশ বেহাল হচ্ছে, কৃষকের আয় কমছে। এইজন্য যদি ছোট জমিতে ধান-মাছ-হাঁস-মুরগি ইত্যাদি একসঙ্গে একের সাথে অন্যকে মিলিয়ে চাষ করা যায়, যদি আবর্জনা, পশুপাখির মলমূত্র বা গাছগাছড়া দিয়ে সার-কীটনাশক বানিয়ে নেওয়া যায় তাহলে চাশের খরচ কমে, সারাবছর খাবারের জোগান ও থাকে, কৃষকেরও আয় বজায় থাকে, পরিবেশও বাঁচে। এর জন্য দরকর 'সুসমন্বিত চাষ পদ্ধতি' ইংরেজিতে যা ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং। আমরা এই চাষকেই ফিরিয়ে আনতে চাইছি। তারজন্য এই বই। যেখানে এই চাষ কখন-কীভাবে-কী দিয়ে করব তার সমস্ত কলা-কৌশল পরপর লেখা থাকল। ইচ্ছে একটাই, তা হল এই চাষ বাড়ুক, কৃষকের ভালো হোক, আমাদের ভালো হোক, পরিবেশ বাঁচুক। এইবার বইটা যদি কাজে লাগে, যত কাজে লাগে ততই আমাদের ভালো।

নির্মল হোক আমাদের নীল গ্রহ! নীরোগ-ঝলমলে থাকুক আমাদের পড়শি-নগর!

দিলীপ সরকার
সম্পাদক ।। ডি আর সি এস সি
মে ২০২১ ।। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

সূচি

ভূমিকা ■১
কেন এই চাষ ■৩
এই কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কিভাবে লাভবান হওয়া সম্ভব ■৫
সাধারণ কৃষককে সুসমন্বিত চাষে নিয়ে যাবার পদ্ধতি ■৮
সাধারণ চাষ থেকে সুসমন্বিত চাষ - রূপান্তরের সিদ্ধান্তের খসড়া ■১১
পরিকল্পনা ও নকশা ■১৫
নানা উপাদানের সমন্বয় ■২০
নানা মডেল ■২২
সুসমন্বিত চাষব্যবস্থায় প্রাণীসম্পদ ■২৭
সুসমন্বিত চাষে বায়োগ্যাস ■৩৮
কেঁচোসার ■৩৯
বীজ ■৪৫
জৈব নিবিড় রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ ■৫০
সবজি পোকা ■৫১
কোন সবজিতে কি কি ধরনের রোগ হয় ■৫৪
ধানের পোকা ■৫৯
বন্ধু পোকা ■৬১
ধানের রোগ ■৬৩
ডালজাতীয় শস্যের পোকা ■৬৬
ডালজাতীয় শস্যের রোগ ■৬৮
জৈব নিবিড় রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ ■৭২

ভূমিকা

সুসমন্বিত চাষ ব্যবস্থাপনা পরিবেশের-ভারসাম্য বজায় রেখে কৃষকের পরিবারের যে সমস্ত কৃষি উদ্যোগ আছে, যেমন ধানচাষ, সবজি, মাছ ও প্রাণীসম্পদ প্রভৃতির মধ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক সুসমন্বয় গড়ে তুলে সারাবছর আয়ের সুযোগ তৈরি করা। এতে চাষের উপকরণ বাবদ খরচ যেমন কম হয়, তেমনি একাধিক উৎস থেকে উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকের জীবন জীবিকারও সমৃদ্ধি ঘটে।

সুসমন্বিত চাষ ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হল, খামার ও প্রাণীসম্পদের বর্জ্যকে সুদক্ষভাবে পুর্নব্যবহার করা, আবর্জনাকে পুষ্টি উৎপাদনে রূপান্তরিত করা, সুদক্ষ ফসল ব্যবস্থাপনা, শস্য পর্যায় অবলম্বন করা এবং অন্যান্য পরিপূরক কৃষি উদ্যোগ খামার পরিকল্পনার মধ্যে যোগ করা। অর্থাৎ কৃষি ফসল, প্রাণী সম্পদ যেমন দেশি মুরগি, হাঁস, ছাগল, গরু প্রভৃতি মাছ ও জলজ উৎপাদন, কৃষি বনায়ন, মাশরুম চাষ, মৌমাছি পালন, আবর্জনা থেকে উত্তম কম্পোস্ট তৈরি, অ্যাজোলা চাষ, বায়োগ্যাস প্রভৃতির সমন্বয় গড়ে ওঠা একটিই ব্যবস্থাপনা।

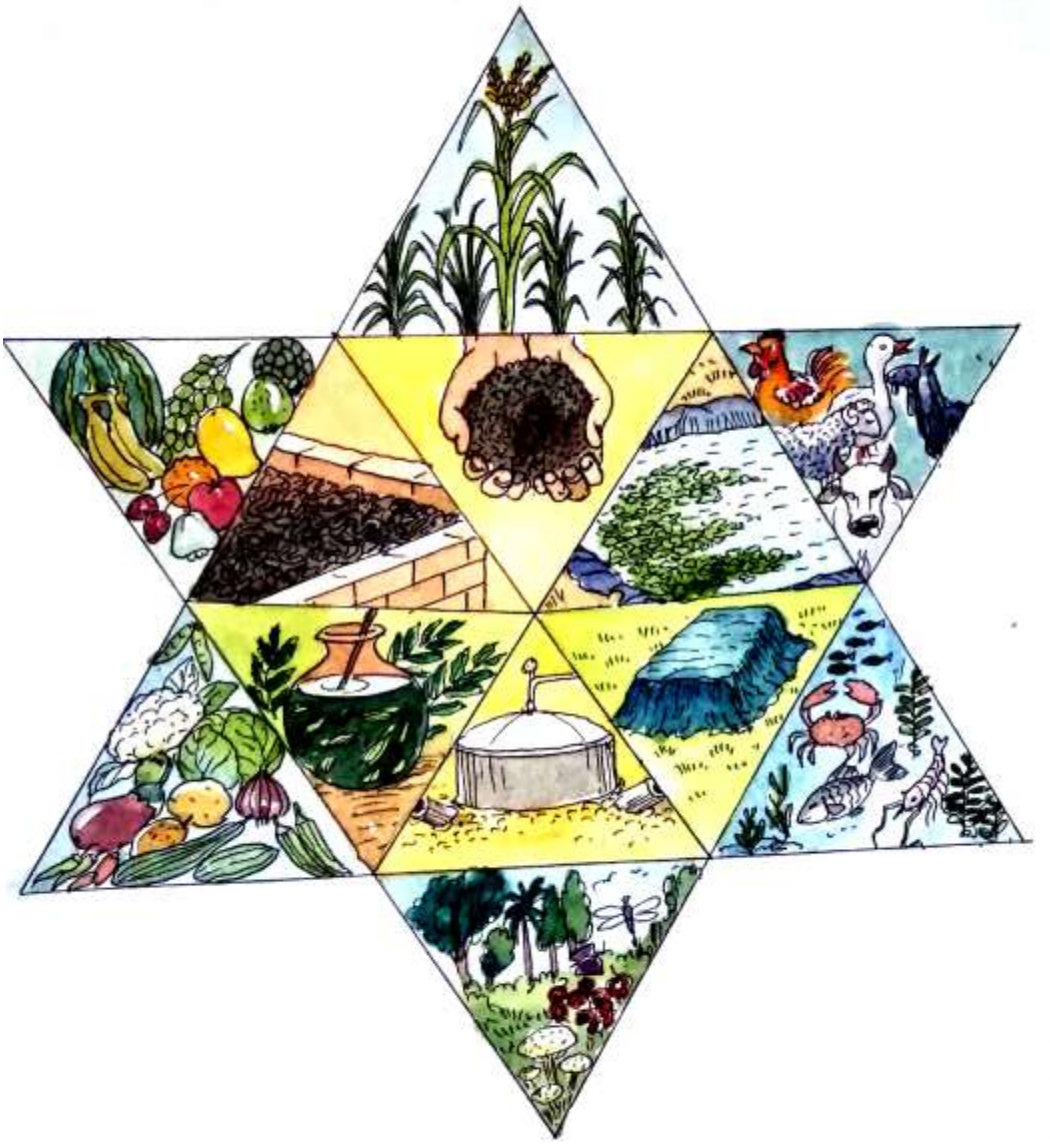

কেন এই চাষ

১। চাষযোগ্য জমি ক্রমশ কমে যাচ্ছে

নগরায়ন, শিল্প, রাস্তাঘাট ও বাড়ি তৈরির জন্য চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য যোগাতে আমাদের একক প্রতি জমিতে আরো বেশি খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে।

২। জন প্রতি চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে :

যেহেতু জন প্রতি চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমশ কমে যাচ্ছে, তাই পরিবারের ভরণপোষণ চালানোর জন্য ছোট জমিতে বিবিধ ধরনের ফসল উৎপাদনের জন্য সুসমন্বিত চাষ ব্যবস্থা একটি আদর্শ পদ্ধতি ।

৩। মরশুম ভিত্তিক আয়, কর্মসংস্থান ও কাজের খোঁজে স্থানান্তর :

বৃষ্টি নির্ভর চাষব্যবস্থা কৃষকরা কেবলমাত্র বর্ষাকালে চাষ করতে পারে, তাই কৃষিনির্ভর জীবিকাতে কেবলমাত্র একটি ঋতুতে রোজগার করতে পারে। তাই রোজগারের খোঁজে তাদের অন্য জায়গাতে স্থানান্তরিত হতে হয়। সুসমন্বিত চাষ ব্যবস্থা এমন এক চাষ ব্যবস্থা যেখানে কৃষক সারাবছর কিছু না কিছু রোজগার করতে পারে এবং সারাবছর কৃষক পরিবার নিজের ক্ষেতে কাজে নিয়োজিত থাকতে পারে।

৪। কৃষকের সম্পদের অবক্ষয়:

সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে যেহেতু কৃষক পরিবারে জল, জমি, আবর্জনা প্রভৃতি যথাযথ ব্যবহার হয় না তাই, সুসমন্বিত চাষ ব্যবহারের মাধ্যমে তার দক্ষ ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব। এই চাষ ব্যবস্থাপনাতে যেহেতু বাইরের উপকরণ খুবই কম ব্যবহার করা হয় তাই লাভও সর্বাধিক হয়।

৫। পরিবারের চাহিদা মেটানো:

খাদ্য, পুষ্টি ও জীবন ধারণের নিরাপত্তার জন্য সুসমন্বিত কৃষি ব্যবস্থাপনা একটি আদর্শ পদ্ধতি। এটি এমন একটি পদ্ধতি যেখানে বছরভর কৃষক পরিবার বিভিন্ন ধরনের নিরাপদ খাদ্য, পশু খাদ্য ও জ্বালানি পেতে পারে।

এই কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কিভাবে লাভবান হওয়া সম্ভব

এই চাষ ব্যবস্থার মাধ্যমে খামারের প্রতি বর্গ ইঞ্চি জায়গার সুদক্ষ ব্যবহার হয়, মাটির উর্বরতা শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পায়, জলের সঠিক ব্যবহার হয়, বর্ষার জল, পুকুরে ধরে রেখে সারাবছর কিছু না কিছু চাষ করা যায়, মিশ্রচাষ, সংরক্ষণ ও সঠিক ব্যবস্থাপনা, শস্যাবর্তন অনুসরণ করা হয়, ফলে প্রতি একক জমিতে উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

স্থায়িত্বশীলতা

এই চাষ পদ্ধতিতে যেহেতু স্থানীয় জলবায়ু সহনশীল উন্নতমানের দেশীয় বীজ, স্থানীয় প্রাণী সম্পদের প্রজাতি ও মাছ চাষ করা হয়, তাই কৃষকের নিজের কাছে বীজ ও প্রজাতি সঞ্চিত থাকে, প্রতিবারে কিনতে হয় না। আপদকালীন সময়েও এরা সহজে মানিয়ে নিতে পারে।

অধিক মুনাফা

যেহেতু অব্যবহৃত ও ফেলে দেওয়া আবর্জনা উৎপাদনের কাজে লাগে ও দেশী বীজ ও জাত ব্যবহার করা হয়। তাই উপকরণ প্রায় কিনতে হয় না। আবার এমনভাবে খামার পরিকল্পনা করা হয়, যাতে রোগ পোকার আক্রমণ খুবই কম লাগে, আগাছা কম হয়। তাই উৎপাদনের খরচ ক্রমশ কমে যায়। আবার কৃষকের রোজগারের উৎসগুলির বিবিধতা বাড়ে -যেমন কৃষি ফসল, মাংস, ডিম, মাছ, ফল প্রভৃতি। সর্বোপরি কৃষকের মোট মুনাফার পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়।

পশুখাদ্য, জ্বালানি ও সুষম খাদ্য পাওয়া যায়

সুসমন্বিত চাষ ব্যবস্থাপনাতে বৈচিত্রপূর্ণ ফসল থাকে, ফলে কৃষক পরিবার শর্করা, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন ও খনিজ লবণ যথেষ্ট পরিমাণে বছরভর পেতে থাকে। আবার পশুখাদ্য ও জ্বালানি পাওয়ার জন্যও সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা করা হয়।

পরিবেশ সুরক্ষিত থাকে

সুসমন্বিত চাষ ব্যবস্থাপনায় সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে করা হয়, কোনো রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার করা হয়না। আবার বাড়ির চারপাশের ছড়িয়ে থাকা আবর্জনা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিয়োজিত করা হয় তাই বাড়ির চারপাশ দূষণমুক্ত থাকে।

নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি সম্বন্ধে কৃষক শিক্ষা পায়

কৃষি সম্পদে সমৃদ্ধ কৃষক নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা করে। তাই কৃষক নতুন প্রযুক্তি শেখার সুযোগ পায়। যেমন বায়োগ্যাস, কেঁচো সার তৈরি, অ্যাজোলা চাষ ও অন্যান্য নানা উপকরণ তৈরি করতে শেখে।

সাধারণ কৃষককে সুসমন্বিত চাষে নিয়ে যাবার পদ্ধতি

কৃষক নির্বাচন - নিজের খামারের জন্য শ্রম দিতে পারবে এমন প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষককে নির্বাচন করতে হবে।

খামার নির্বাচন

কৃষকের বাড়ির কাছাকাছি ২০ শতক বা তার থেকে বেশি জমি আছে এমন ক্ষেত সুসমন্বিত চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে। জমিতে মোট ক্ষেতের ১/৫ ভাগ আয়তন পুকুর আছে বা নতুন করে পুকুর খনন করা যাবে এমন জমি নির্বাচন করতে হবে।

বর্তমানে ক্ষেতে কী কারণে উৎপাদনশীলতা কম তা বিশ্লেষণ করা

সমগ্র ক্ষেতকে ছোট ছোট কৃষি বাস্তুতন্ত্রে বিভক্ত করে, প্রতিটি কৃষি বাস্তুতন্ত্রে কি কি কারণে বর্তমানে উৎপাদন কম হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করতে হবে।

সমগ্র ক্ষেতের কৃষি বাস্তুতন্ত্রের নকশা তৈরি

প্রতিটি ছোট ছোট বাস্তুতন্ত্র ধরে আর কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া যায় তা নির্বাচন করতে হবে। যেমন উপকরণের পরিবর্তন, ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন, ভূমিরূপের পরিবর্তন প্রভৃতি।

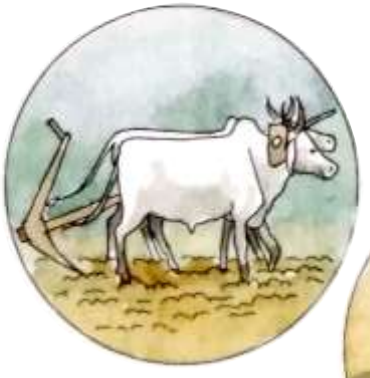

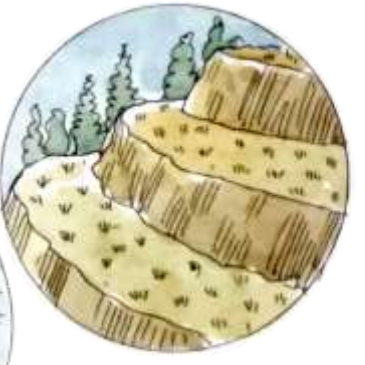

পরিবর্তিত উদ্যোগের ফলাফল বিশ্লেষণ

প্রতি মরশুমের শেষে ক্ষেতের পরিবর্তিত নকশার ফলে উৎপাদনে কতটা পরিবর্তন এল, কত লাভ হল বা ব্যবস্থাপনায় কোনো সমস্যা হলে তা বিশ্লেষণ করে পুনরায় তার সংশোধন করতে হবে।

সাধারণ চাষ থেকে সুসমন্বিত চাষ — রূপান্তরের সিদ্ধান্তের খসড়া

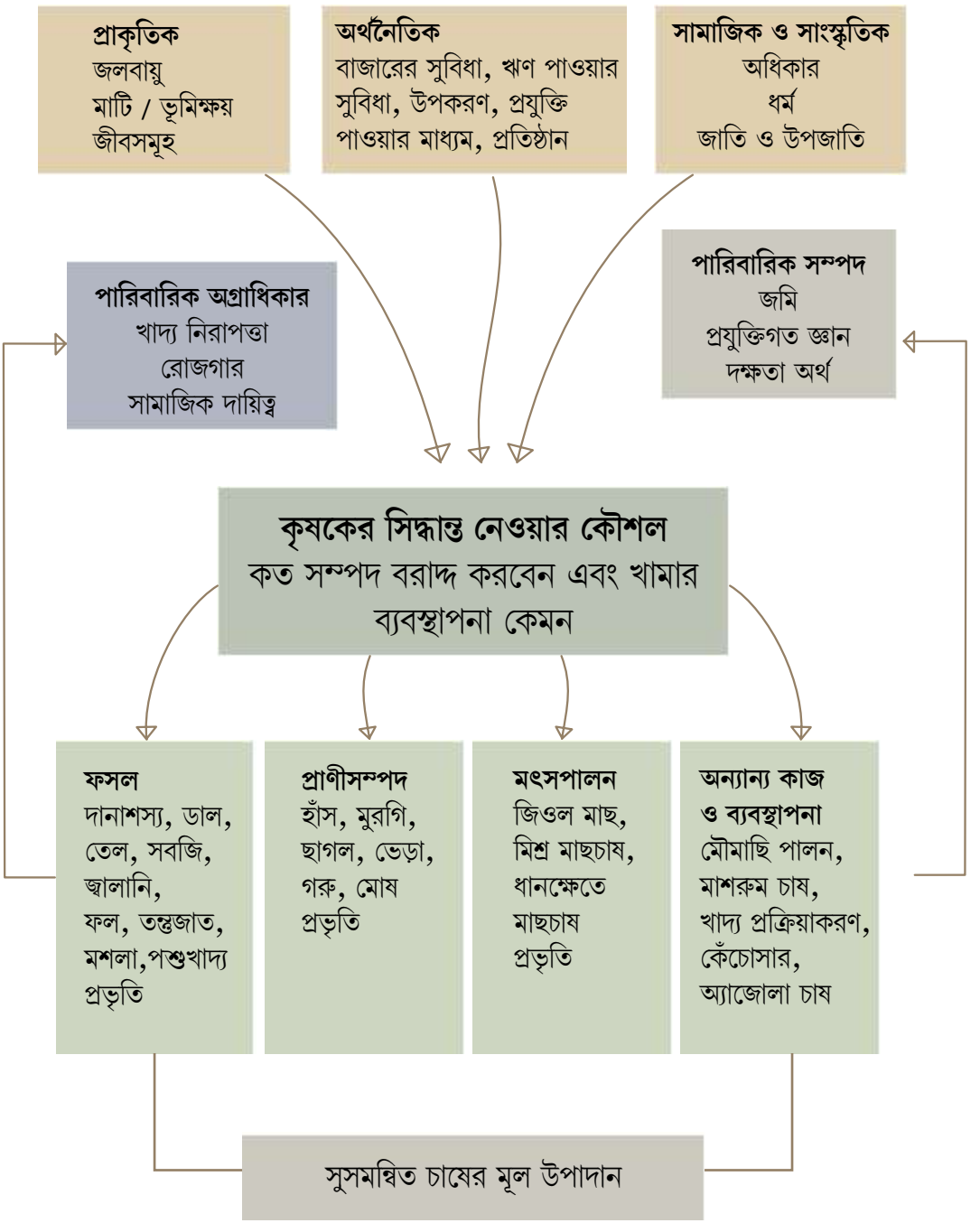

সাধারণ চাষ থেকে সুসমন্বিত চাষ — রূপান্তরের সিদ্ধান্তের খসড়া

প্রাকৃতিক
জলবায়ু মাটি/ভূমিক্ষয়
জীবসমূহ

অর্থনৈতিক
বাজারের সুবিধা, ঋণ পাওয়ার
সুবিধা, উপকরণ, প্রযুক্তি
পাওয়ার মাধ্যম, প্রতিষ্ঠান

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক
অধিকার ধর্ম
জাতি ও উপজাতি

পারিবারিক অগ্রাধিকার
খাদ্য নিরাপত্তা রোজগার
সামাজিক দায়িত্ব

কৃষকের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কৌশল
কত সম্পদ বরাদ্দ করবেন এবং খামার
ব্যবস্থাপক কেমন

পারিবারিক সম্পদ
জমি প্রযুক্তিগত
জ্ঞান দক্ষতা অর্থ

ফসল
দানাশস্য, ডাল, তেল, সবজি, জ্বালানি,
ফল, তন্তুজ, মশলা, পশুখাদ্য প্রভৃতি,

প্রাণীসম্পদ
হাঁস, মুরগি, ছাগল, ভেড়া,
গরু, মোষ প্রভৃতি

মৎসপালন
জিওল মাছ, মিশ্র
মাছচাষ, ধানক্ষেতে
মাছচাষ প্রভৃতি

অন্যান্য কাজ ও ব্যবস্থাপনা
মৌমাছি পালন, মাশরুম চাষ, খাদ্য
প্রক্রিয়াকরণ, কেঁচোসার, অ্যাজোলা চাষ

সুসমন্বিত চাষের মূল উপাদান

ধানভিত্তিক সুসমন্বিত চাষের বিভিন্ন উপাদান

- ধান + মাছ
- ধান + মাছ + অ্যাজোলা
- ধান + মাছ + অ্যাজোলা + হাঁস
- ধান + মাছ + অ্যাজোলা + হাঁস + মুরগি
- ধান + মাছ + অ্যাজোলা + হাঁস + মুরগি + সবজি চাষ
- ধান + মাছ + অ্যাজোলা + হাঁস + মুরগি + সবজি চাষ + ছাগল / ভেড়া / অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রাণী সম্পদ
- ধান + মাছ + অ্যাজোলা + হাঁস + মুরগি + সবজি চাষ + ছাগল / ভেড়া / অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রাণী সম্পদ / গরু / মোষ
- ধান + মাছ + অ্যাজোলা + হাঁস + মুরগি + সবজি চাষ + ছাগল / ভেড়া / অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রাণী সম্পদ / গরু / মোষ / কম্পোস্ট / কেঁচো সার / বায়ো গ্যাস

একটি আদর্শ সুসমন্বিত কৃষি ব্যবস্থাপনায়
পুষ্টি ও শক্তির প্রবাহ

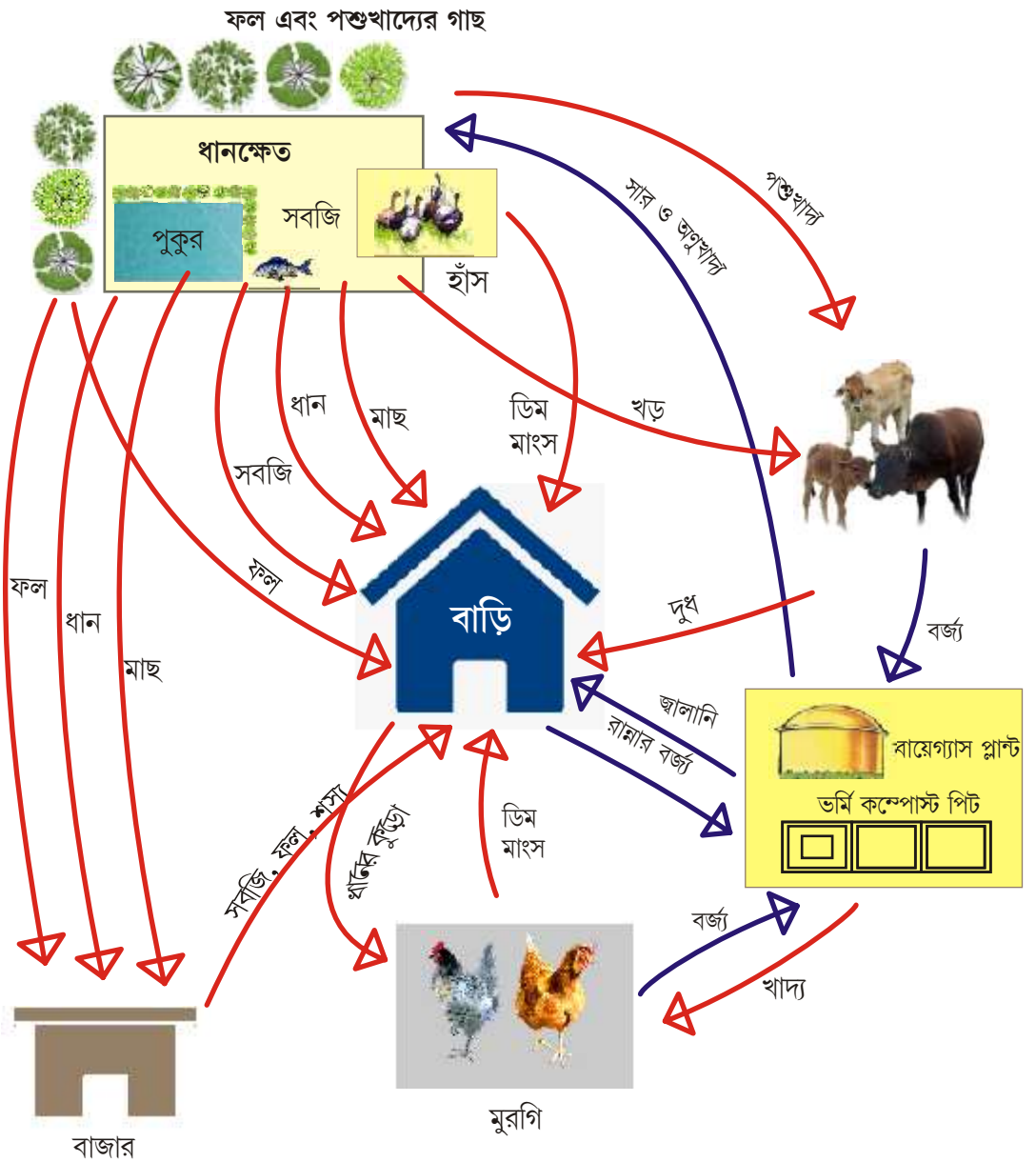

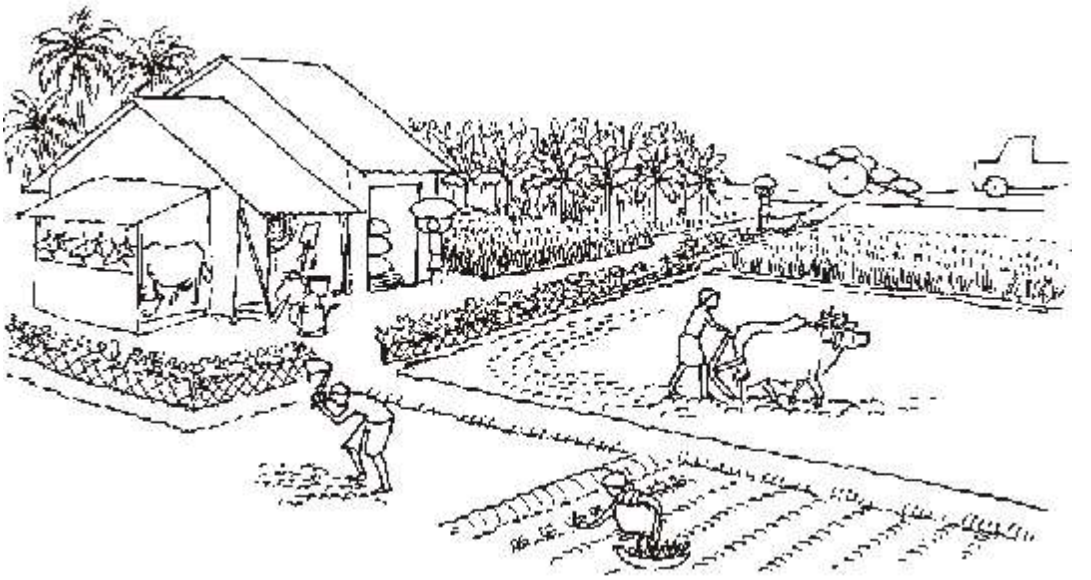

পরিকল্পনা ও নকশা

কৃষকের কাছে যে সমস্ত গ্রহণযোগ্য সম্পদ আছে সেগুলিকে দক্ষ ব্যবহার করে, কৃষকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের উপযোগী করে খামার পরিকল্পনা করাকে সুসংহত খামার পরিকল্পনা বলে।

সুসংহত খামার পরিকল্পনা

মূলনীতি

১। সমগ্র খামারের বিভিন্ন অংশের আলাদা করে পরিকল্পনা করতে হবে।

২। প্রতিটি পরিকল্পিত উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে অন্য ব্যবস্থার সুদক্ষ সমন্বয় করতে হবে।

৩। এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে বাইরের উপকরণ কম বা না ব্যবহার করতে হয়।

৪। এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে খামার পরিচালনার খরচ কম হয়।

৫। নির্ভুল তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা করতে হবে।

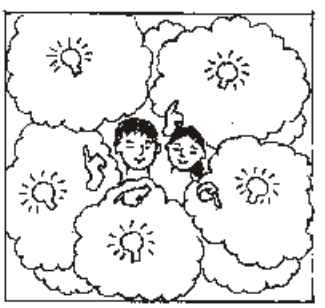

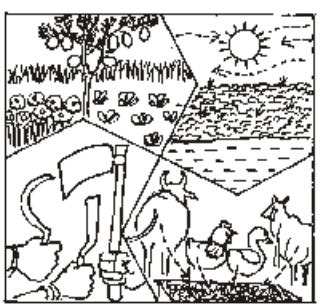

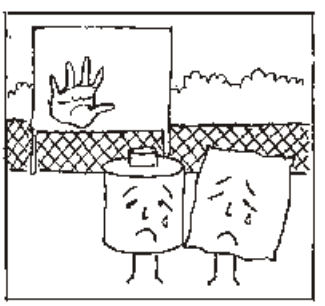

ধাপ ১

লক্ষ্য নির্ধারণ

- কৃষকের পারিবারিক প্রত্যাশা ও চাহিদা জানতে হবে
- কি পরিমাণ ফলন/আয় পেতে চান তা নির্ধারণ করতে হবে
- স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি তা জানতে হবে

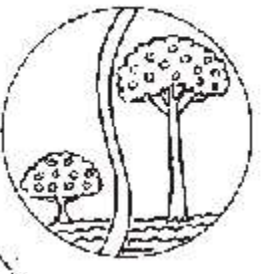

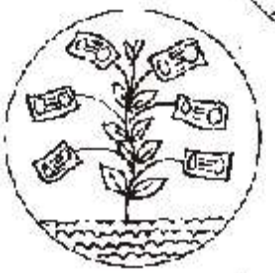

ধাপ ২

প্রাপ্ত সম্পদের তালিকা ও পরিমাণ নির্ধারণ

প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ ও ধরন জানা

- জমির আয়তন কত
- জমির ধরন, উঁচু, নীচু, চারণভূমি, উর্বরতা প্রভৃতি
- জলের উৎস, পরিমাণ ও গুণগত মান
- প্রাণীসম্পদ গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি

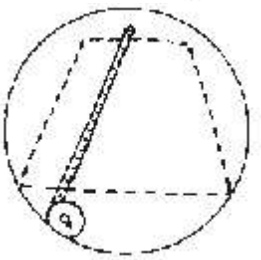

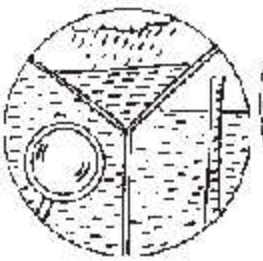

মানব সম্পদ

- শ্রম কতটা পাওয়া সম্ভব
- দক্ষতা কেমন
- মনোভাব
- এই কাজের জন্য কোনো প্রশিক্ষণ আছে কিনা?

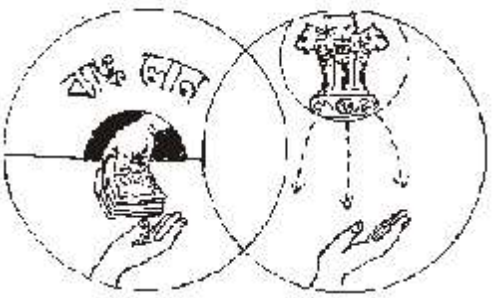

এছাড়াও যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ যেগুলি হল ঃ

- বাতাস কোন দিক থেকে আসে ও তার গতিবেগ
- দিনের ও রাতের দৈর্ঘ্য
- গড় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
- গড় বৃষ্টিপাত
- গড় আর্দ্রতা

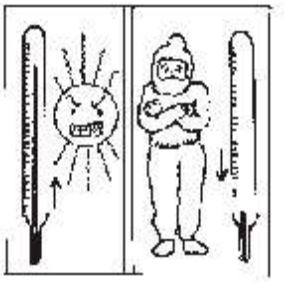

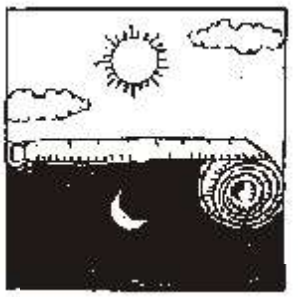

সুসংহত খামার পরিকল্পনা বিভিন্ন ধাপ

ধাপ ১ লক্ষ্য নির্ধারণ
ধাপ ২ প্রাপ্ত সম্পদের তালিকা ও পরিমাণ নির্ধারণ
ধাপ ৩ কার্য্য পরিকল্পনা
ধাপ ৪ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ

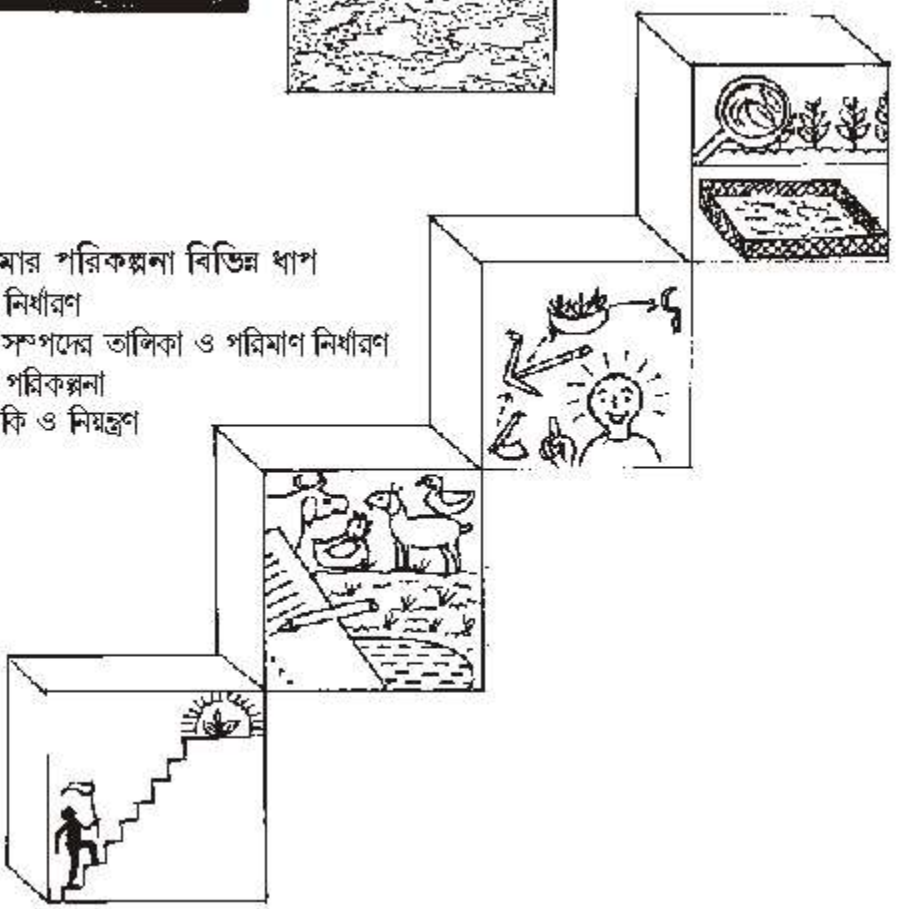

আর্থিক সম্পদ

- নিজের মূলধনের পরিমাণ
- ঋণের সুবিধা আছে কিনা
- সুদের হার কত

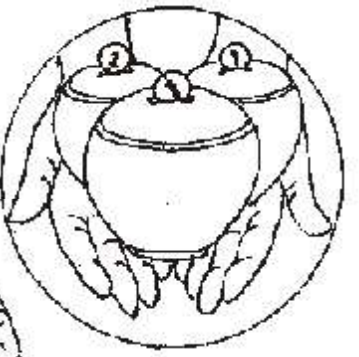

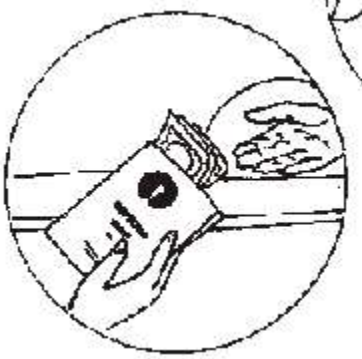

ধাপ ৩ ঃ কার্য্য পরিকল্পনা

উপরের দুটি ধাপের ভিত্তিতে কার্য্য পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। কৃষকের সামনে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে সেগুলি সঠিকভাবে বিবেচনা করে এমন কার্য্য পরিকল্পনা করতে হবে, যাতে কৃষকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে পূরণ হয়, নতুবা সব কিছু মূল্যায়ন করে আবার কার্য্য পরিকল্পনার পরিবর্তন বা উৎকর্ষ সাধন করতে হবে।

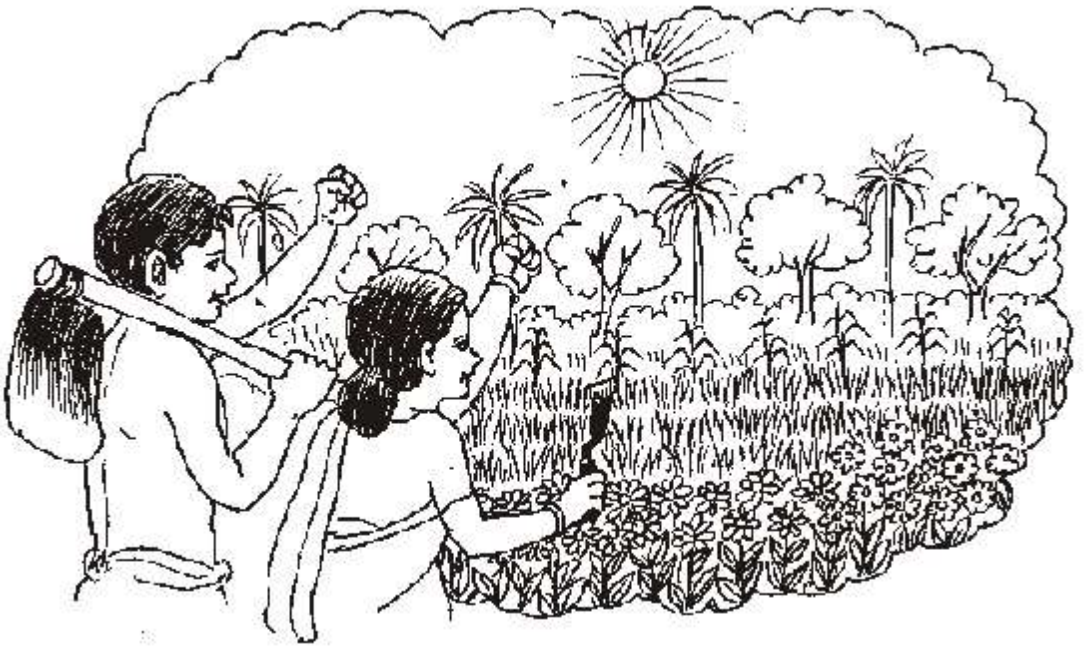

ধাপ ৪ ঃ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ

সঠিকভাবে কার্য্য পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য নিয়মিত তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পরিকল্পনা রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে যে নতুন নতুন সুযোগ, সম্ভাবনা তৈরি হবে সেগুলি নিয়ে আবার কর্ম পরিকল্পনা বা লক্ষ্য নির্ধারণে যোগ করে নিতে হবে। নিয়মিত তথ্য রাখতে ও বিশ্লেষণ করতে হবে।

নানা উপাদানের সমন্বয়

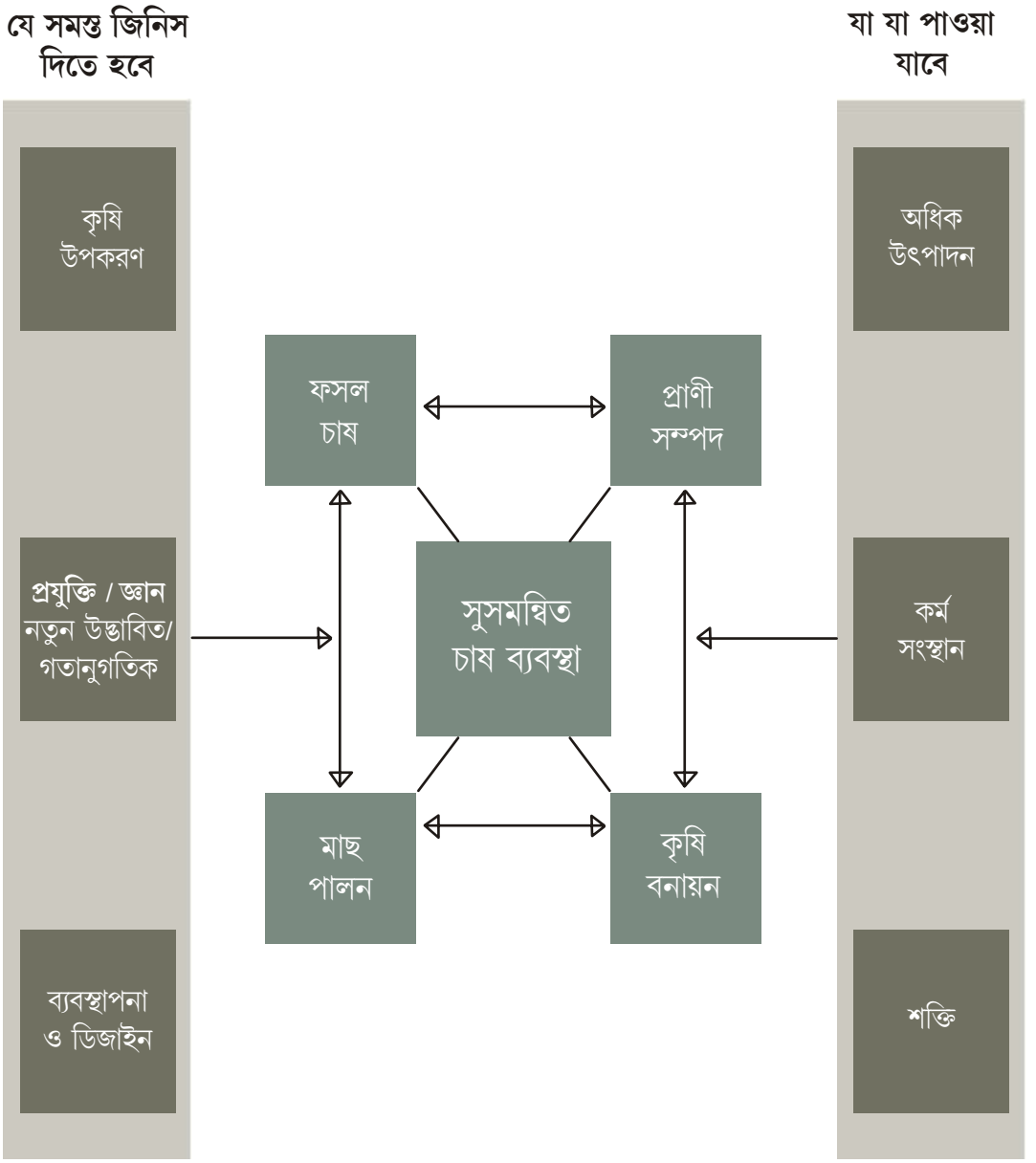

নানা উপাদানের সমন্বয়

কৃষি উপকরণ

প্রযুক্তি / জ্ঞান
নতুন উদ্ভাবিত / গতানুগতিক

ব্যবস্থাপনা
ও ডিজাইন

ফসল চাষ

প্রাণীসম্পদ

সুসমন্বিত চাষ ব্যবস্থা

জলজ চাষ

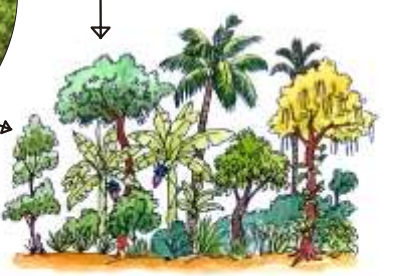

কৃষি বনায়ন

শক্তি

কর্ম সংস্থান

অধিক উৎপাদন

নানা মডেল

সাধারণ সুসমন্বিত চাষ ব্যবস্থার ২টি মডেল হয়ে থাকে

১। একটি জমিতে ভিত্তি করে মডেল তৈরি করা

২। গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা একটি কৃষকের সমস্ত কৃষি জমির মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলে সুসমন্বিত চাষ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সাধারণত যে সমস্ত কৃষকের একলপ্তে বড় চাষযোগ্য জমি নেই, সেখানে কৃষকের সমস্ত ছোট ছোট জমির মধ্যে সুসমন্বয় গড়ে তুলে খামার পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে।

সাধারণত বর্ষার জলের উপর নির্ভর করে আমন ধান চাষ করে থাকেন কৃষকেরা। বর্ষার পরে যেহেতু কোনো জলের উৎস থাকে না এবং মাটি লবণাক্ত হয়ে যায়, তাই জমি আমন ধান চাষের পরে ফাঁকা পড়ে থাকে।

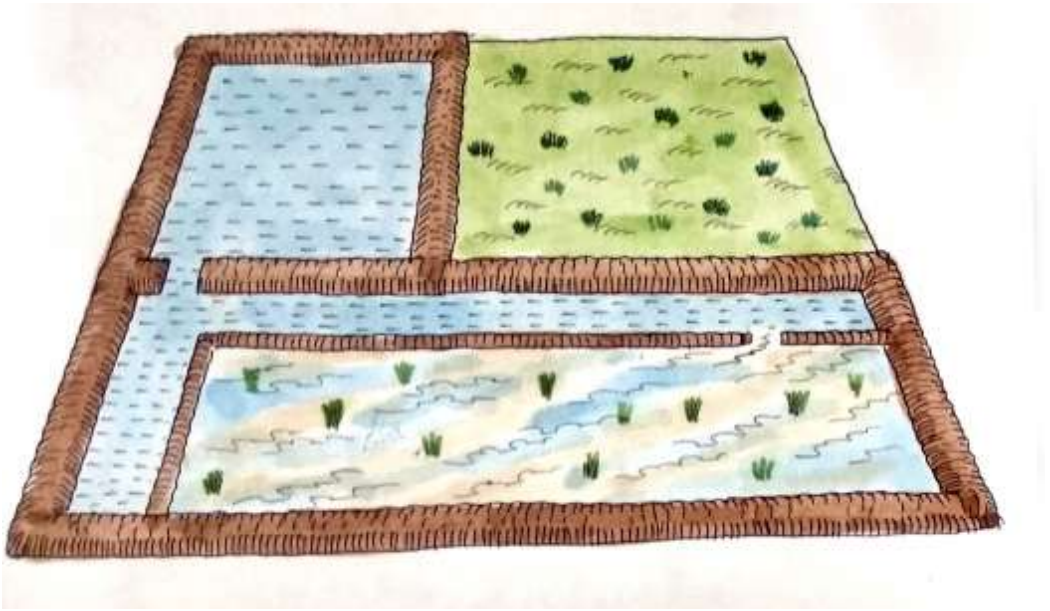

আমন ধান ভিত্তিক একক ফসলের জমির ভূমিরূপ পরিবর্তন করে পুকুর ও তার পাড়ে সারাবছর ডাঙ্গা জমিতে ধান ও সবজি চাষের জন্য ভূমির পরিবর্তন করা হয়েছে।

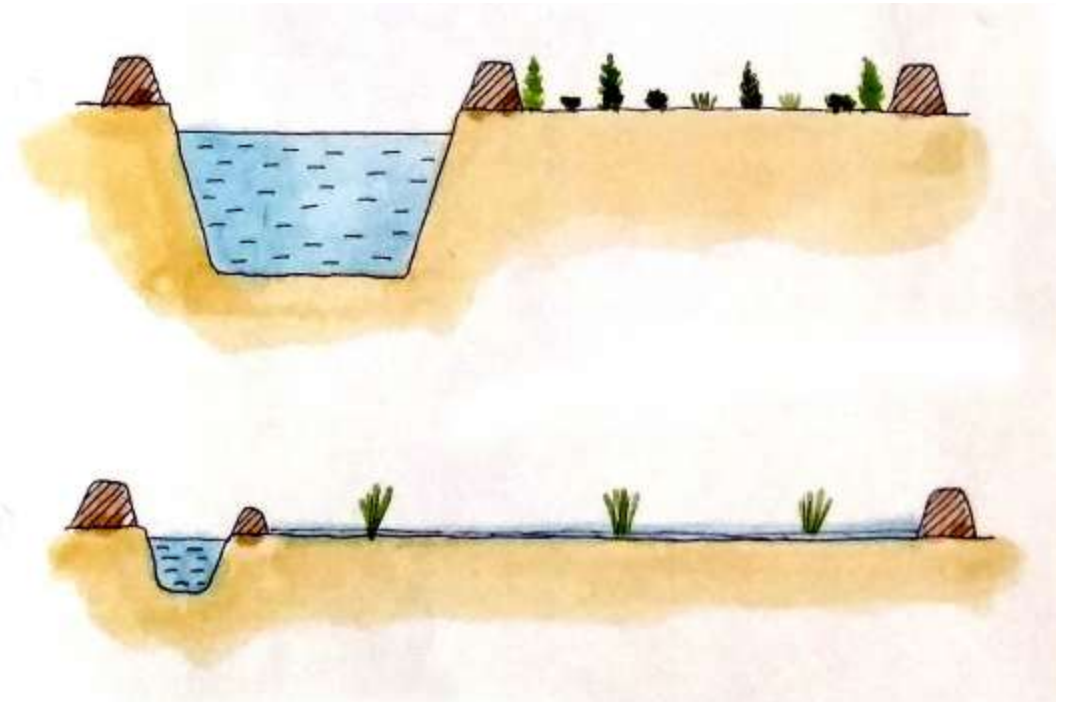

সুসমন্বিত জমির পূর্ণাঙ্গ মডেল (ফসল ছাড়া) চিত্র

পুকুর ও পুকুর পাড়ের ব্যবহার

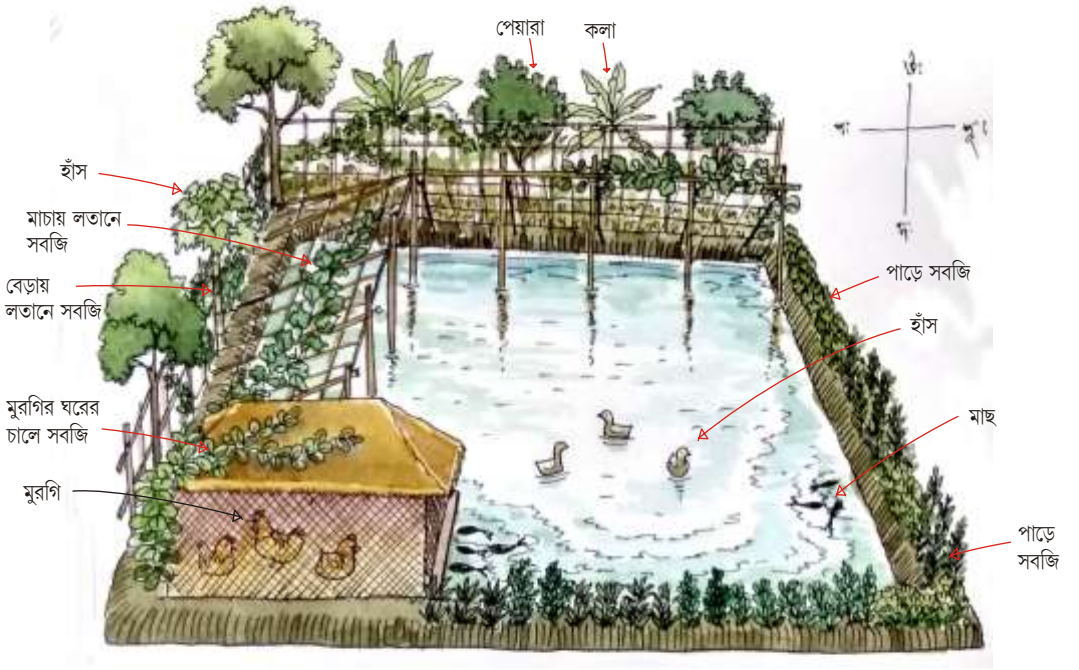

সুসমন্বিত চাষে পুকুর ও পুকুরের পাড়ের ব্যবস্থাপনা

সুসমন্বিত চাষে ধান জমির ব্যবস্থাপনা

সুসমন্বিত চাষে ডাঙা জমির ব্যবস্থাপনা

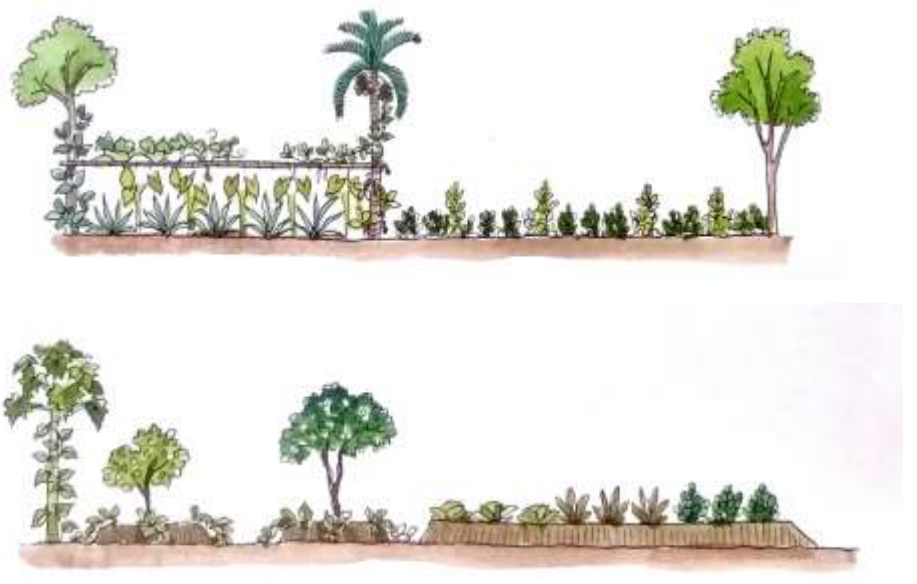

সুসমন্বিত চাষব্যবস্থায় প্রাণীসম্পদ

মুরগি

আমাদের দেশে পুষ্টিকর খাদ্য বিশেষ করে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের প্রচুর অভাব। প্রোটিনের অভাবে গ্রামের অধিকাংশ মানুষের মানসিক ও শারীরিক বৃদ্ধি যথাযথভাবে হয়না। মুরগি পালন করতে পারলে এই অভাব সহজেই দূর হয়। মুরগির ডিম ও মাংস সহজে হজম হয় এবং অতি পুষ্টিকর। আবার এই প্রাণীপালনে গ্রামের প্রতিটি পরিবারে মুরগি সহজে পালন করা যায়। যেমন অপুষ্টি দূর হয়, তেমনি গ্রামের বেকার সমস্যাও দূর হতে পারে। এই ব্যবসায় মূলধন কম লাগে। দক্ষতাও খুব বেশি প্রয়োজন হয় না।

মুরগির চাহিদা	মুরগির উৎপাদন
খাদ্য	মাংস
স্বাস্থ্যকর ঘর	ডিম
বিশুদ্ধ পানীয় জল	সার
ডিম পাড়ার পাত্র	অর্থ
প্রাকৃতিক শত্রু থেকে রক্ষা	পালক
ছায়া	আগাছা নিয়ন্ত্রণ

মুরগি পালনের উদ্দেশ্য

- পারিবারিক আয় বৃদ্ধি
- এলাকায় কর্মসংস্থান
- বসতবাড়ির ছোট জমি উৎপাদনের কাজে লাগানো
- বাড়ির ফেলে দেওয়া খাদ্যকে কাজে লাগানো
- জৈবসারের জোগান বাড়ানো
- পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা সুনিশ্চিত করা
- মুরগির পালক দিয়ে নানা রকম শৌখিন জিনিস বানানো

মুরগি পালনের জন্য যা যা জানা দরকার

এজন্য বিশেষ কোনো জ্ঞান বা দক্ষতা আয়ত্ত করার দরকার হয় না। সাধারণ কয়েকটি বিষয় ভালো করে জানলেই মুরগি পালন করা যায়। এগুলি হল :

- মুরগির জাত
- মুরগির ঘর
- মুরগির খাবার
- মুরগির যত্ন ও রোগ প্রতিরোধ
- ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায়

মুরগির জাত বাছাই

গ্রামের অধিকাংশ পরিবার দেশি জাতের মুরগি পালন করে। এই সমস্ত মুরগি ছাড়া থাকে এবং বাড়ির ফেলে দেওয়া খাবার, আশপাশের পোকামাকড় ও গাছের পাতা খেয়ে বড় হয়। এই জাতের মুরগির ডিমের সংখ্যা সাধারণত কম। কিন্তু খরচ খুবই কম হওয়ার কারণে, দেশি মুরগি ঘরে ঘরে পালন করা সম্ভব।

১. **চাটগাঁ** : এই মুরগি পালন করা হয় মাংসের জন্য। তবে বছরে ১০০-র বেশি ডিমও পাওয়া যায়। একটি পরিণত বয়সের মোরগের ওজন হয় ৩-৪ কেজি ও মুরগির ওজন ২-২.৫ কেজি।
২. **আসিল** : এই জাতের একটি পরিণত বয়সের মোরগের ওজন হয় ৩-৪ কেজি এবং মুরগির ওজন ২-২.৫ কেজি। এদের মাংস সুস্বাদু। ডিম দেয় বছরে ১৫০টিরও বেশি।
৩. **লোলাব** : এদের মাংস খুব সুস্বাদু হয়। পরিণত বয়সে মোরগের ওজন হয় ২-৩ কেজি ও মুরগির ওজন ১.৫ -২ কেজি। বছরে ডিম দেয় ১০০-র বেশি।

কিন্তু মুরগি পালনের খুব ছোট ব্যাবসা করলেও উন্নত জাতের মুরগি পালন করা ভালো। বিজ্ঞানীরা কিছু উন্নত জাতের মুরগি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই সমস্ত মুরগি দেশি মুরগির মতোই কম খরচে ও যত্নে পালন করা যায়।

ডিমের জন্য ঃ
কলিঙ্গ ব্রাউন, স্বর্ণধারা, রাজশ্রী, ক্যারিগোল্ড, গ্রামলক্ষ্মী, আর.আই.আর. প্রভৃতি।
মাংসের জন্য :
গিরিরাজা, কৃষি ব্রো, ক্যারি শ্যাম, ক্যারি নির্ভীক প্রভৃতি।

মাংস ও ডিম উভয়ের জন্য :
যমুনা, বনরাজা, গ্রামশ্রী, নিকোরক, নন্দনম, হিট ক্যারি, উপক্যারি, নিশিবারি, আর.আই.আর. অস্ট্রালর্প প্রভৃতি।

সঙ্করায়নের মাধ্যমে দেশী মুরগিকে উন্নত জাতের মুরগি করার পদ্ধতি :
- এজন্য ১০টি ভালো জাতের দেশি মুরগি পিছু ১টি উন্নত জাতের মোরগ যেমন আর.আই.আর. নিউ হ্যাম্পশায়ার, অস্ট্রালর্প (কালো মুরগি), হোয়াইট লেগহর্ন (সাদা মুরগি) একটি ঘেরা জায়গাতে রাখতে হবে।
- দেশী মুরগি ও উন্নত জাতের মোরগের মিলনের পর যে ডিম পাওয়া যাবে তা থেকে বাচ্চা ফোটাতে হবে।

- বাচ্চা হওয়ার পর স্ত্রী ও পুরুষ আলাদা করতে হবে। এবার স্ত্রীগুলিকে রেখে পুরুষ বাচ্চাগুলিকে বেছে নিতে হবে। এইভাবে দেশি মুরগি থেকে বেশি ডিম ও মাংস পাওয়া সম্ভব।

ভালো মুরগি চেনার উপায় :

মাথার ঝুঁটি : ভালো মুরগির মাথার ঝুঁটি হবে উজ্জ্বল লাল রঙের ও মোটা।
চোখ : চোখের দৃষ্টি হবে চনমনে এবং উজ্জ্বল।
ঠোঁট : ঠোঁট হবে গাঢ় হলুদ।
পায়ু : পায়ু হবে হলদেটে ও চওড়া।

মুরগির থাকার জায়গা-ঘর ঃ

সাধারণত তিনভাবে মুরগিকে রেখে পালন করা হয়।

১. **মুক্তাঙ্গন** : এই পদ্ধতিতে মুরগিকে সারা দিন ছেড়ে রাখা হয়। রাতে সুরক্ষার জন্য রাখা হয় একটা ছোট ঘরে।

২. **আবৃতাঙ্গন** : এই পদ্ধতিতে মুরগিকে পুরোপুরি একটা জায়গায় বন্ধ করে রাখা হয়, বাইরে চরতে দেওয়া হয়না। বাইরে থেকে খাবার ও অন্যান্য দরকারি জিনিস সরবরাহ করা হয়। এইভাবে মুরগি পালনে খরচ বেশি। তাই আবৃতাঙ্গন গরিব পরিবারের পক্ষে সম্ভব নয়।

৩. **অর্ধমুক্তাঙ্গন** : এই পদ্ধতিতে কোনো গরিব পরিবারের সহজেই ছোট আকারের ব্যাবসাভিত্তিক মুরগি পালন সম্ভব। এই পদ্ধতিতে মুরগিকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য একটি ছোট ঘর থাকে। ওই ঘরের চারদিকে আরো অনেকটা জায়গা নিয়ে সস্তা নাইলনের সুতোর জাল দিয়ে ঘেরা হয়। মুরগি সারাদিন ঘেরা জালের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় আর রাতে বিশ্রামের সময় ঘরে ঢোকে।

অর্ধমুক্তাঙ্গন পদ্ধতিতে মুরগির ঘর :

- মুরগি পিছু ২ বর্গফুট জায়গা দিলে ভালো।
- ঘরটি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হলে বাতাস চলাচল ভালো হয়।
- ঘরটি হবে মাটি থেকে ১.৫-২ ফুট উঁচুতে পাটাতনের উপর। এতে ঘর স্যাঁতস্যাঁতে হবে না। মুরগির রোগ কম হবে।
- ঘরের উচ্চতা হবে ৫-৬ ফুট।
- রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে ঘরে দিতে হবে খড় বা টালির ছাউনি।

মুরগির ঘরের সরঞ্জাম

১. খাবারের পাত্র

প্রথম কয়েকদিন বাচ্চা মুরগিগুলিকে কাগজে ছড়িয়ে খাবার খাওয়াতে হবে। তার কিছুদিন পর পাত্রে শুকনো খাবার দিতে হবে। মুরগি বড় হলে ২৫ সেমি চওড়া, ১৫ সেমি গভীর ও ৩-৪ ফুট লম্বা বাঁশ, টিন বা কাঠের পাত্র তৈরি করে খেতে দিতে হবে। এই পাত্রের সুবিধা হল মুরগি পাত্রে উঠে খেতে বা মলত্যাগ করতে পারবে না।

২. জলের পাত্র

মুরগিকে সব সময় পরিষ্কার পানীয় জল দিতে হবে। একটি থালায়, মাটির ছোট কলসি বা প্লাস্টিকের বালতি জল ভর্তি করে উপুড় করে রাখলে, ঝরনার মতো জল বেরোয় এবং মুরগি প্রয়োজন মতো জল খেতে পারে।

৩. বালি-স্নানের ব্যবস্থা

মুরগির স্বভাব ধুলো বালি, ছাই গায়ে মাখা। তাই একটি পাত্রে ধুলো বালি ও ছাই মিশিয়ে রেখে দিলে মুরগি সময় মতো বালি-স্নান করতে পারে। আবার ওই ধুলোর মধ্যে কিছুটা দোক্তা পাতার গুঁড়ো মিশিয়ে রাখলে মুরগির উকুন মরে যায়।

৪. ঝিনুক, কাঁকর ও চুনাপাথর

মুরগির ডিমের খোলার গঠন এবং খাদ্য পরিপাকের জন্য এইগুলি নিয়মিত খাওয়া দরকার।

৫. ডিম পাড়ার বাক্স

একটি বাক্সে বা পাত্রে কিছুটা কাটা খড় ভরে রেখে দিলে মুরগি সেখানে ডিম পাড়তে পারে।

মুরগির খাবার

ক্ষয় পূরণ ও স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে আর বেশি পরিমাণে ডিম ও মাংস পেতে মুরগির পর্যাপ্ত পরিমাণে সুষম খাদ্য প্রয়োজন।

বাচ্চা মুরগির খাবার

বাচ্চা মুরগিকে জন্মানোর পর প্রথম ৩ দিন পাউরুটির টুকরো দুধে ভিজিয়ে নিংড়ে ঝুরো করে দিতে হবে। এরপর থেকে খুব ছোট ছোট করে ভাঙা গম, ভুট্টা, চালের গুঁড়ো, ডিমের খোসা, চুনাপাথরের গুঁড়ো মিশিয়ে খেতে দিতে হবে।

বড় মুরগির খাবার

দেশি ও উন্নত-দেশি বড় মুরগির দানাযুক্ত খাদ্য :

চাল, গম বা ভুট্টার খুদ	৩০	ভাগ
গমের ভুসি বা লাল কুঁড়ো	২৫	ভাগ
সরষে, তিল বা তিসি খোল	৩৫	ভাগ
নুন ও সবুজ শাকসবজি	১০	ভাগ
	মোট ১০০	**ভাগ**

এই খাবার মুরগি প্রতি, ৫০-৭৫ গ্রাম সকালে-বিকালে ভাগ করে খাওয়াতে হবে। যারা এই খাবার দিতে পারবে না, তারা জোগাড় করা খাবারও ব্যবহার করতে পারে। সেক্ষেত্রে অ্যাজোলা, জংলি কচুর ডাঁটা বা ডুমুর এনে ভালো করে সিদ্ধ করে সঙ্গে চাল বা ভুট্টার খুদ, অল্প খোল এবং সবজির পাতা, সুবাবুল পাতা এবং গেঁড়ি, গুগলি, ঝিনুক ইত্যাদি মিশিয়ে মুরগিকে খাওয়ালেও ডিম ও মাংস ভালো পাওয়া যায়।

ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানো

ডিম থেকে বাচ্চা আনতে দরকার উর্বর ডিম। এই ডিম পেতে ১০টি মুরগি পিছু ১টি সুস্থ ও তেজি মোরগ রাখতে হবে। এর ফলে যে ডিম পাওয়া যাবে সেগুলিই উর্বর ডিম।

বাচ্চা ফোটানোর উপযুক্ত ডিম বাছাই

১. মুরগির ডিম সাধারণত সাদা বা লালচে-ধূসর রঙের হয়। এর মধ্যে থেকে উজ্জ্বল ও চকচকে রঙের ডিম বাছাই করতে হবে।
২. ডিমগুলো একটু বড় আকারের, ৫০-৬০ গ্রাম ওজনের হতে হবে।
৩. খোসা পুরু ও শক্ত হতে হবে। কোনোভাবেই যেন পাতলা না হয়।
৪. ডিমগুলি ৭-১০ দিন বয়সের হবে।
৫. ফাটা বা নাড়ালে শব্দ হয় এমন ডিম ব্যবহার করা যাবে না।

মা মুরগি নির্বাচন

রোগমুক্ত, শান্ত স্বভাবের, মাঝারি ওজনের মুরগিকে ডিমে তা দেবার জন্য বাছতে হবে। যে মুরগি ডিম পাড়ার পর ডিমের উপর থেকে উঠতে চায়না, সেই মুরগি তা দেওয়ার জন্য আদর্শ।

ডিমে তা

আকারের সাপেক্ষে একটি মুরগি ১০-১৫টি পর্যন্ত ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটাতে পারে।

তা দেওয়ার পাত্র

বাঁশের ঝুড়ি বা মাটির চওড়া পাত্রে কাঠের ভুসি, খড়, শুকনো বালি ইত্যাদি বিছিয়ে তা দেবার উপযুক্ত করতে হবে। এছাড়া এক হাত লম্বা, এক হাত চওড়া এবং এক থেকে দেড় হাত উচ্চতা বিশিষ্ট বাক্সেও বাচ্চা ফোটানো যায়। সেক্ষেত্রে বাক্সের গায়ে কয়েকটি ফুটো করে দিতে হবে।

তা দেওয়া মুরগির যত্ন ও পরিচর্যা

- যে মুরগি তা দেবে, তাকে দিনে ২-৩ বার খাবার ও জল খাওয়াতে হবে।
- বাচ্চা ফোটানোর জায়গাটায় যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো-বাতাস চলাচল করে।
- তা দেওয়া মুরগির শরীরে প্রচুর উকুন হয়। এই জন্য ডিম ফোটানোর পাত্রে ১০দিন অন্তর দোক্তা গুঁড়ো ছড়িয়ে দিতে হবে।
- মাটিতে মুরগির বিষ্ঠা পড়ে মাটি সবজি চাষের জন্য উর্বর হয়ে ওঠে।
- মাটির মধ্যে যে সমস্ত পোকামাকড় থাকে তা খেয়ে নষ্ট করে দেয়।
- মাটির আগাছা নির্মূল করে দেয়।

এইভাবে সবজি চাষের জমিতে মুরগির ট্রাক্টর ১৫-২০ দিন রেখে দিলে সবজি চাষের জমিতে সবজির বীজ বোনার উপযুক্ত হয়ে যায় এবং এরপর পাশের জমিতে একইভাবে খাঁচাটা সরিয়ে দেওয়া যায়।

মুরগির টিকাকরণ ও চিকিৎসা

রোগ	মুরগির বয়স	টিকা
১. বসন্ত রোগ	২ মাস	ফউল পক্স
২. রাণীক্ষেত	৪-৭ মাস	RDF - ১
	দেড় মাস	RDF - ১ (বুস্টার ডোজ)
	সাড়ে চার মাস	RDF - ২ বি
	৯ মাস	RD - ল্যাসোটা
	এরপর প্রতি মাস অন্তর	RD - ল্যাসোটা

পুষ্টি বাগানের সঙ্গে মুরগি পালন পদ্ধতি

- পুষ্টি বাগানকে সমান ২ ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। বাগানের চারিদিকে বেড়া দিতে হবে।
- বাগানের একদিকের মাঝখানে একটি মুরগির ঘর তৈরি করতে হবে, এমনভাবে যাতে ঘরের দুদিকে বের হওয়ার দরজা থাকে ।
- বাগানের একদিকে পুষ্টি বাগানের জন্য সবজি চাষ করতে হবে এবং অন্যদিকে মুরগি ছাড়া থাকবে সারাদিন। এর ফলে মুরগি চরে বেড়ানোর জায়গাটি মুরগির বিষ্ঠা জমে মাটি উর্বর হবে এবং ওই অংশের পোকামাকড় খেয়ে মুরগি পোকার উপদ্রবও কমিয়ে দেবে।

- একটি মরশুম সবজি চাষ হয়ে গেলে মুরগিগুলোকে উল্টো দিকে সবজি বাগানে ছাড়া থাকবে এবং যে জায়গাটি আগে মুরগি ছাড়া থাকত সেখানে নতুন করে সবজি বাগান তৈরি করতে হবে। যেহেতু জায়গাটি মুরগির বিষ্ঠা পড়ে উর্বর করে রেখেছে তাই সহজেই সবজি উৎপাদন করা যাবে।

পুকুরে মাছ চাষের সঙ্গে মুরগি চাষ

পুকুরের উপর মুরগির ঘর

- প্রতি শতকে পুকুরের জন্য ৪-৫টি মুরগি রাখা যাবে।
- মুরগির বিষ্ঠা পুকুরে পড়লে পুকুরে প্রচুর প্ল্যাঙ্কটন জন্মাবে। ফলে প্রাকৃতিকভাবে মাছের খাবার তৈরি হবে ও মাছের উৎপাদন বাড়বে।

সুসমন্বিত চাষে হাঁস চাষ

যে সমস্ত অঞ্চলে পুকুর, নদী, নালা, খাল-বিল বেশি আছে, সেখানে অতি সহজে দেশি হাঁসের চাষ করা সম্ভব। দেশি হাঁস ফেলে দেওয়া ও ঘরোয়া খাবার খেয়ে খুব সহজে বেড়ে ওঠে এবং ডিম ও মাংস পাওয়া যায়।

হাঁসের চাহিদা	হাঁস থেকে উৎপাদন
খাবার	ডিম
জল	মাংস
ঘর	অর্থ
প্রাকৃতিক শত্রু থেকে রক্ষা	সার
সুস্বাস্থ্য	শ্রম - আগাছা নিয়ন্ত্রণ ও পোকা নিয়ন্ত্রণ পালক

ধান ক্ষেতে হাঁস পালন

ধান ক্ষেতে হাঁস চাষ একটি লাভজনক চাষ, কিন্তু এইরকম চাষের জন্য কৃষকের কিছু ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

- ধান রোপণ করার ১৫-২০ দিন পর থেকে ২০ দিনের বাচ্চা হাঁস জমিতে ছাড়তে হবে।
- প্রতি শতক ধান ক্ষেতে ১টি হাঁস ছাড়তে হবে।
- হাঁসগুলি দিনের বেলা ধান ক্ষেতে ছেড়ে দিতে হবে এবং রাতে সুরক্ষিত জায়গাতে রাখতে হবে।
- হাঁসকে সারাদিন ১ বার খেতে দিতে হবে এবং বাকি খাবার হাঁস ধান জমির আগাছা, পোকা, গেঁড়ি, গুগলি খেয়ে পুরো করবে।
- ধানে থোঁড় সুপুষ্ট হলে হাঁস আর জমিতে ছাড়া যাবে না

ধান ক্ষেতে হাঁস পালনের সুবিধা

- অতি কম খাবার দিয়েও পালন করা যাবে।
- হাঁস ধান ক্ষেতের পোকামাকড় ও আগাছা খেয়ে ধানের পোকা নিয়ন্ত্রণ করবে এবং আগাছা নিয়ন্ত্রণ করবে।
- হাঁসের বিষ্ঠা ধান ক্ষেতের উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে।
- হাঁসের চলাচলের ফলে ধান জমির জলের মধ্যে অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে, ফলে ধান গাছের শিকড় ও গাছের ভালো বৃদ্ধি হবে।

সুসমন্বিত কৃষি ব্যবস্থাপনায় - ধান ক্ষেতে মাছ চাষ

ধান ক্ষেতে নির্দিষ্ট সময় ধরে বর্ষার জল জমে থাকে যা নিঃসন্দেহে মাছ চাষের জন্য একটি আদর্শ পরিবেশ। ধান ক্ষেতে ব্যবহৃত সার, গোবর ইত্যাদি, জল ও মাটির সাথে মিশে প্রাকৃতিকভাবে খাবার তৈরি করে যা মাছ উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ধান ক্ষেতে মাছ চাষের প্রযুক্তি ব্যবহার করে একজন চাষি ধান উৎপাদনের সাথে সাথে বাড়তি আয়ও পেতে পারে। আমন মরশুমেই ধান ক্ষেতে মাছ চাষ করা সম্ভব। ধান ক্ষেতে মাছ চাষ প্রযুক্তি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শুধু অর্থই যোগান দেয় না সেই সাথে তাদের পুষ্টিও নিশ্চিত করে।

ধান ক্ষেতে মাছ চাষের সুবিধা

- একই জমি থেকে ধানের সাথে অতিরিক্ত ফসল হিসেবে মাছ পাওয়া যায় সুতরাং জমির সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব।
- ধান ক্ষেতে আগাছা কম জন্মে এবং অনিষ্টকারী পোকা-মাকড় মাছ খেয়ে ফেলে। ফলে ধানক্ষেতে কীটনাশক ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।
- মাছের চলাফেরার মাধ্যমে ক্ষেতের কাদামাটি উলটপালট হয় ফলে জমি হতে ধানের পক্ষে অধিকতর পুষ্টি গ্রহণযোগ্য হয়।
- মাছের বিষ্ঠা সার হিসাবে ধান ক্ষেতের উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে।

মাছ চাষের জন্য জমি নির্বাচন

সব ধান ক্ষেত মাছ চাষের জন্য উপযোগী নয়। ধান ক্ষেতে মাছ চাষের সফলতা নির্ভর করে জমি নির্বাচনের ওপর। জমি নির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জমি নির্বাচনের সময়

বিবেচনাধীন বিষয়সমূহঃ

- সাধারণত দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ এবং এটেল মাটির জল ধারণ ক্ষমতা এবং উর্বরা শক্তি বেশি এসব মাটির জমি ধান ক্ষেতে মাছ চাষের জন্য উপযোগী।
- অতি উঁচু অর্থাৎ জল ধরে রাখতে পারে না এবং অধিক নীচু জমি অর্থাৎ সহজেই প্লাবিত হয় সে সব জমি মাছ চাষের অনুপযোগী।
- বন্যার জল প্রবেশ করে না এরূপ উঁচু জমিই মাছ চাষের উপযোগী।

মাছের প্রজাতি নির্বাচন

মাছের প্রজাতি নির্বাচন লক্ষ্যণীয় বিষয়সমূহঃ

- অগভীর জলে চাষ করা যায় এমন প্রজাতির মাছ নির্বাচন করতে হবে।
- কম অক্সিজেনে বাঁচতে পারে এমন প্রজাতির মাছ।
- দ্রুত বর্ধনশীল ও অযত্নে বেড়ে উঠতে পারে, এমন প্রজাতির মাছ নির্বাচন করতে হবে। যেমন - শিঙ্গি, মাগুর, কই, রুই, কাতলা, মৃগেল ও অন্যান্য দেশি প্রজাতির মাছ।

মাছের পোনা মজুত

- ধান ক্ষেতে ধান রোপণের পরপরই পোনা মজুত করতে নয় না, রোপণের পর ধানের চারা মাটিতে শিকড় মেলে শক্ত হতে ও ধানের কুশী গজাতে ১০-১৫ দিন সময় লাগে। এজন্য ১৫-২০ দিন পর ধান ক্ষেতে মাছের পোনা মজুত করতে হবে।
- জমিতে কমপক্ষে ১০-১৫ সেমি. জল থাকা অবস্থায় প্রতি শতক ৫-২০টি ৫-৭ সেমি. আকারের পোনা ছাড়তে হবে।
- সকালে অথবা বিকালে অর্থাৎ যখন জল ঠান্ডা থাকে তখন ক্ষেতে পোনা মজুত করা উচিত। এ নিয়মে পোনা মজুত করলে ধান চাষকালীন সময়ের অর্থাৎ ১০০-১২০ দিনের মধ্যেই মাছ খাওয়ার ও বিক্রয়ের উপযোগী হয়ে থাকে।

ধান ক্ষেতে জলের ব্যবস্থাপনা

- মাছ ধান ক্ষেতে থাকা অবস্থায় সবসময় জল থাকতে হবে। প্রাথমিক অবস্থায় ক্ষেতে জলের গভীরতা ১০-১৫ সেমি. থাকতে পারে, তবে মাছের বৃদ্ধির সাথে সাথে জলের গভীরতা বাড়াতে হবে।
- যদি কোন সময় বাইরে থেকে জল সরবরাহের প্রয়োজন হয়, তখন পুকুরের জল সরবরাহ করতে হবে। বা ধান ক্ষেতের সঙ্গে মূল পুকুরের যোগ থাকতে হবে।
- ইঁদুর, কাঁকড়া ও অন্যান্য প্রাণী যাতে আলে গর্ত না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ধান ক্ষেতে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত খাবারই মাছের বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট। তবে প্রাকৃতিক খাবারের

অপর্যাপ্ততা পরিলক্ষিত হলে প্রয়োজনবোধে মাছের খাবার হিসেবে অ্যাজোলা বা চালের কুঁড়ো সরবরাহ করা যেতে পারে।

- ধান রক্ষার জন্য জমিতে রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য জৈব পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

ধান ক্ষেতে মাছ আহরণ

- ধান পাকার পর ক্ষেতের জল কমিয়ে ধান কাটার ব্যবস্থা নিতে হবে, এ সময় মাছ আস্তে আস্তে ডোবায় চলে যাবে এবং মাছ ধরতে হবে।
- ধান ক্ষেতে সমন্বিত পদ্ধতিতে মাছ চাষ করলে ৩-৪ মাসে হেক্টর প্রতি ৩২৫-৩৫০ কেজি মাছের ফলন পাওয়া যায়।
- অনেক ক্ষেতে দেখা গেছে যে, ধানের সাথে মাছ চাষ করলে ধানের ফলন গড়ে প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ বেশি হয়। এতে চাষিরা অধিক মুনাফা অর্জন করে থাকে।

পরামর্শ

- ধান ক্ষেতে কীটনাশক ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।
- অতি বৃষ্টিতে যেন ধান ক্ষেত প্লাবিত না হয় অথবা খরায় ধান ক্ষেত শুকিয়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- চাষিকে দৈনিক সকাল ও বিকালে ধান ক্ষেত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

সুসমন্বিত চাষে বায়োগ্যাস

বায়োগ্যাস হল সুসমন্বিত কৃষির অন্যতম একটি প্রধান উপাদান। এখান থেকে কৃষক পরিবার যেমন পারিবারিক রান্নার জ্বালানি পেয়ে থাকে, আবার বায়োগ্যাসের স্লারি থেকে উৎকৃষ্ট কেঁচো সারও তৈরি করতে পারে। অর্থাৎ গোবর ও অন্যান্য প্রাণীর বিষ্ঠা এবং অন্যান্য পচনশীল বস্তুর উৎকৃষ্ট ও সঠিক ব্যবস্থাপনা হয়ে থাকে।

বায়োগ্যাস হল পচনশীল জৈববস্তু সমূহ হতে তৈরি গ্যাস। সব প্রাণীরই মল হতে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে এই গ্যাস তৈরি করা যায়। পশুর গোবর ও অন্যান্য পচনশীল পদার্থ বাতাসের অনুপস্থিতিতে পঁচানোর ফলে যে গ্যাস তৈরি হয় তাই হচ্ছে বায়োগ্যাস। তবে গৃহপালিত বা বাণিজ্যিকভাবে পালিত পশুপাখি এবং মানব মল সহজলভ্য বলে এগুলোই বেশি ব্যবহার করা হয়। বায়োগ্যাস উৎপাদনের পর অবশিষ্ট আবর্জনাটুকু উত্তম জৈব সার হিসেবে বেশ কার্যকরী।

বায়োগ্যাসের রেখাচিত্র

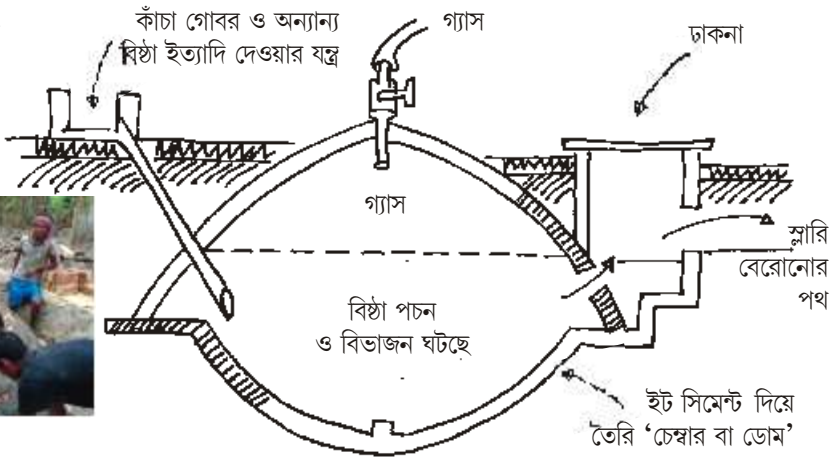

বায়োগ্যাস তৈরির কাঁচামাল

যে কোন পচনশীল বস্তু বায়োগ্যাস তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন

- মলমূত্র (মানুষ, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি ইত্যাদি)
- তরি-তরকারি, ফল-মূল ও মাছ-মাংসের ফেলনা অংশ
- লতাপাতা, বিভিন্ন আবর্জনা ও কচুরিপানা

বিভিন্ন ধরনের বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট

বায়োগ্যাস উৎপাদনের জন্য প্রধানত দু ধরনের প্ল্যান্ট ব্যবহৃত হয়। এগুলো হল

- ফিক্সড ডোম বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট
- ভাসমান ডোম বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট

বায়োগ্যাস ব্যবহারের অসুবিধা

- প্ল্যান্ট তৈরি করতে এককালীন বেশ কিছু টাকার দরকার হয়।
- কাঁচামালের জন্য নিজেদের গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি থাকতে হয়।
- বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট সাধারণভাবে তৈরি করা যায় না।

কেঁচোসার

কেঁচোসারে জমি চাষে সুফলের শেষ নেই। চাষজমিকে সব দিক দিয়ে ভাল রাখতে এই সারের জুড়ি মেলা ভার। যদি জমির মাটিতে বাতাস চলাচল করাতে হয়, জমির জলধারণ ক্ষমতা ও নিকাশি ব্যবস্থাকে ভাল করে তুলতে হয়, কিংবা মাটির অম্ল ও ক্ষারের মধ্যে সমতা আনতে হয়, তবে জমিতে এই সারের ব্যবহার খুব ভাল ফল দেয়। রাসায়নিক সারকে তফাতে রেখে জৈব সারের ফলন তৈরিতে, জমিতে কেঁচোসারের মিশেল খেতকে শস্য-সবুজও ফলবান করে গড়ে তোলে।

কেঁচো চাষ করে কী লাভ

কেঁচো কাঁচা বা আধপচা জৈব আবর্জনাকে গাছগাছালির জন্য প্রয়োজনীয় উন্নতমানের খাদ্যে রূপান্তরিত করে। কেঁচোর মলমূত্র ও দেহ নিস্সৃত রস থেকেই কেঁচোসার বা ভার্মিকম্পোস্ট তৈরি হয়। কেঁচোসার গাছগাছালির এক আদর্শ খাদ্য। এই সার দিলে গাছগাছালির খাদ্যের জোগান তো হয়ই, পাশাপাশি গাছের, রোগ ও পোকার সঙ্গে মোকাবিলা করার শক্তিও বাড়ে। এই সার ব্যবহারে মাটি পুষ্ট হয়, মাটির গঠন ভাল হয় আর মাটির জলধারণ ক্ষমতাও বাড়ে।

কেঁচোসার যেমন নিজের জমিতে ব্যবহার করা যায়, তেমন করা যায় বিক্রিও। সংখ্যায় বাড়ার পর অতিরিক্ত কেঁচো মাছ বা মুরগির খাবার হিসেবে বিক্রি করা যায় অথবা সেগুলি দিয়ে নতুন কেঁচো পালন শুরু করা যায়। হিসেবে বিক্রি করা যায় অথবা সেগুলি দিয়ে নতুন কেঁচো পালন শুরু করা যায়।

আর ব্যাবসা নির্ভর কোনো উদ্যোগের ক্ষেত্রে কেঁচো পালনে কিছু সুবিধে আছে। যেমন ঃ কেঁচো কোনও শব্দ করে না, মলমূত্রেও কোনও দুর্গন্ধ নেই আর একবার ঠিকমতো জায়গা তৈরি করে দিলে, খুব সামান্য যত্নেই তারা তাড়াতাড়ি বাড়ে ও বংশবৃদ্ধি করে।

কেঁচোর থাকার জায়গা, খাবার, বংশবৃদ্ধি

কেঁচো অন্ধকার, স্যাঁতস্যাঁতে ও ঠান্ডা জায়গায় থাকতে পছঃদ করে। নানা ধরনের কেঁচো নানাভাবে মাটির উর্বরতা বাড়ায়। সব কেঁচোকেই চাষ করে বাড়ানো সম্ভব নয়।

কেঁচোর চোখও নেই, কানও নেই। কিন্তু তারা আলো ও ঝাঁকুনি অনুভব করতে পারে এবংএর কোনোওটাই পছন্দ করে না। ১২° থেকে ৩৬° সেলসিয়াস তাপমাত্রা কেঁচোর উপযোগী। কিন্তু ১৫° থেকে ২৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা কেঁচোর পছন্দসই। আর এই তাপমাত্রাই তার দ্রুত বংশবৃদ্ধি ঘটায়। এরা ভিজেমাটিতে থাকতে ভালোবাসে, কিন্তু মাটিতে জল জমলে অর্থাৎ মাটিতে অক্সিজেনের অভাব ঘটলে, তারা মরে যায় অথবা অন্যত্র পালিয়ে যায়। কেঁচো প্রচুর খাবার খায়। দিনভর কেঁচো যা খায়, তা তার শরীরের ওজনের অর্ধেকের সমান। অন্যভাবে বললে, ৫০০ গ্রাম খাবারকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সারে পরিণত করতে হলে ১

কিলো কেঁচোর প্রয়োজন হবে। এর সবচেয়ে পছন্দ, প্রশম মাটি (pH-7)। কিছুটা অম্ল ও ক্ষারযুক্ত মাটিও কেঁচো সহ্য করে।

কেঁচো প্রধানত নিরামিষ খাদ্য পছন্দ করে। সবজির খোসা, গাছগাছালির পাতা, চায়ের পাতা, ফলের ছিবড়ে, টুকরো কাগজ ইত্যাদি সবই কেঁচো খায়। মাছ, মাংস ইত্যাদি প্রোটিন্ন জাতীয় খাদ্য,তেল-ঝাল-মশলা খাবার, পচা দই, ছানা বা দুধ জাতীয় পদার্থ কোনোটাই কেঁচো পছন্দ করে না। এই ধরনের কোনও খাদ্য কেঁচোর বাকসে দিতে হলে, সেগুলিকে আগে আলাদা কোনও জায়গায় ৩-৪ সপ্তাহ ধরে পচিয়ে দেওয়া দরকার। ডিমের বদলে অবশ্য ডিমের খোলা ভালো করে ধুয়ে, শুকিয়ে গুঁড়ো করে দেওয়া যেতে পারে। খাদ্যের মধ্যে প্লাস্টিক বা পলিথিন, কোনও কৃত্রিম রং বা কীটনাশক ইত্যাদির খুব সামান্য পরিমাণ উপস্থিতিও কেঁচোর মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে পারে। সাবান, শ্যাম্পু ইত্যাদি মেশানো জলও কখনই দেওয়া চলবে না।

কেঁচোর ডিম একরকম থলি বা আবরণের মধ্যে থাকে। থলির মধ্যে এই ডিমের বৃদ্ধি ঘটে ও শিশু কেঁচো জন্ম নেয়। এই থলি বা আবরণকে বলে কোকুন। প্রথম দিকে কোকুনের রং থাকে সাদাটে। কিন্তু কোকুন্ন ফেটে শিশু কেঁচো বের হয়ে আসার আগে তার রং পাল্টে হালকা তামাটে হয়। একটি ডিম প্রমাণ আকার নিতে ও ভালোভাবে ফুটতে, দুই থেকে তিন সপ্তাহ সময় লাগে। একটা কোকুন বা ডিম থেকে প্রায় ৩-৭টি কেঁচোর জন্ম হয়। এক-একটির ওজন্ন হয় ৩-১০ মিলিগ্রাম এবং প্রতিটিই ৩-১০ মিলিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়।

উপযুক্ত কেঁচো বাছাই

সেরা কেঁচোসার তৈরি অনেকটাই নির্ভর করে ঠিক জাতের কেঁচো নির্বাচনের উপর। সেই কেঁচোই বাছতে হবে, যার প্রধান খাদ্য জৈব সমাগ্রীর। যার বংশবৃদ্ধির হার,খাওয়ার পরিমাণ ও মলমূত্র সবচেয়ে বেশি। আর জৈব সামগ্রীর পচনের ফলে তৈরি হওয়া অবস্থা আর আবহাওয়ার তারতম্য যেন এই কেঁচো সবচেয়ে বেশি সহ্য করতে পারে। এইসব জাত হয় সাধারণত লালচে-বাদামি রঙের, মুখের দিকটায় লালচে রং থাকে। প্রমাণ আকারে এগুলো ১৫-২০ সেমি লম্বা হয়। মুখের দিক তুলনায় সূচালো ও পিছনের দিক তুলনায় ভোঁতা। এরা মাটির উপরের স্তরে থাকতে ভালবাসে। তাই সাধারণত গোবর, পশুপাখির মলমূত্র বা আবর্জনার ঢিবির কাছে হদিস করলে, মাটির উপরের স্তরে এদের পাওয়া যায়।

এই ধরনের কয়েকটি ভালো জাতের কেঁচো হল - ইউড্রিলাস ইউজেনি, পেরিওনিক্স এক্সক্যাভেটার পেরিয়ার, আইসেনিয়া ফেটিডা, ল্যামপিটো মৌরিটি কিনবার্ক। এগুলো যে কোনও কেঁচো পালন খামার থেকে আপনি-আমি সহজেই সংগ্রহ করতে পারি।

আবর্জনাকে আধপচা করে নেওয়া

ঘরোয়াভাবে বা বাড়ির বাইরে দু জায়গায়, দুভাবে কেঁচোসার তৈরি করা যায়। বাড়িতে বা বাড়ির বাইরে যেখানেই হোক, কেঁচো চাষের জন্য পাওয়া আবর্জনাকে, আগে থেকে আধাআধি পচিয়ে নিতে হয়। যাকে এককথায় আংশিক বিয়োজন বা আবর্জনাকে আধপচা করে নেওয়া বলে। চলতি কথায় একে বলে 'মিডিয়াম' বা 'মাধ্যম' তৈরি।

বাড়িতে তৈরির ক্ষেত্রে আবর্জনা আধপচা করা

বাড়ির সমস্ত আবর্জনা যে পাত্রে ফেলা হয়, সেই পাত্র ছাড়া আরও একটি পাত্র এই জন্য রাখুন। এই পাত্রে, সহজে পচে এমন জৈব সামগ্রী, যেমন্ন সবজির খোসা, গাছের পাতা, চায়ের পাতা, ফলের ছিবড়ে ইত্যাদি নিয়মিত ফেলতে থাকুন। মনে রাখা দরকার, মাছ, মাংস বা তেল-ঝাল-মশলাদার কোনও কিছু এই পাত্রে

দেওয়া যাবে না। পরপর ১৫ দিন ফেলার পর এই আবর্জনা ফেলার কাজ বন্ধ করে দিন। তবে মাঝে ৭দিনে দুবার উল্টেপাল্টে দিতে হবে। ১৫ দিন হয়ে এলে, আধ পচানোর কাজটিও সম্পূর্ণ হবে।

বাড়ির বাইরে তৈরি

১ ভাগ কাঁচা জৈব সামগ্রী (পাতা, আগাছা, শিকড় বাদ দিয়ে কচুরিপানা, গোবর বা অন্যান্য পশুপাখির মলমূত্র ইত্যাদি) ও ২ ভাগ শুকনো জৈব সামগ্রী, খড়কুটো-তুষ (ধান, গম, খড়, ডাল-এর শুকনো কাণ্ড, ভুসি, কুঁড়ো ইত্যাদি) নিন। সামগ্রীগুলিকে টুকরো টুকরো করে কুচিয়ে কাটুন। টুকরো যত ছোট হবে, কেঁচোর খাওয়ার হার ততই বাড়বে। এবার এইসবগুলিকে মিশিয়ে একটি বড় পাত্রে বা গর্তে এক জায়গায় ঢিবি করে রাখুন। এবার একটি পাত্রে জল, অল্প পরিমাণ কেঁচোসার (জোগাড় করা) বা খামার সার বা কম্পোস্ট বা গোবর নিয়ে তার সঙ্গে মাটি গুলে এই গোলা জল, ঢিবি করে রাখা জৈব সামগ্রীর উপর ছিটিয়ে দিন। খেয়াল রাখুন, যাতে এই ছেটানো জল মারফত মিশ্রণের ৪০-৫০ শতাংশ আর্দ্রতা তৈরি হয়। তারপর এর উপরে কাদা দিয়ে ভালো করে লেপে রেখে দিন ৪ সপ্তাহ। ৪ সপ্তাহ পরে এই কাদা ভেঙে, ১-২ দিন ঠান্ডা ও বাতাস খাওয়ালে, তবে কেঁচোর জন্য উপযুক্ত 'মাধ্যম' তৈরি হবে।

সার তৈরি

সাধারণত দুভাবে কেঁচোসার তৈরি করা যায়

১. ছোট আকারে বাড়ির মধ্যে

২. বড় আকারে বাড়ির বাইরে বা খামারে

১. ছোট আকারে বাড়ির মধ্যে

বাড়ি, গোয়াল বা বাগানের কোনও একটি অন্ধকার কোণা, যেখানটা জলে ডোবে না বা যেখানে জোরালো শব্দ বা ঝাঁকুনির সম্ভাবনা কম, সেই ধরনের জায়গা বেছে নিয়ে কাঠের বাকসে, মাটির বড় গামলা, পলিথিনের বালতি ইত্যাদিতে কেঁচোসার তৈরি করা যায়, তবে রং না করা ছোট কাঠের বাকসোই ঘরোয়া পালনের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক।

গামলায় কেঁচোসার

একটি ৫০ সেমি ব্যাসের গামলা জাতীয় প্লাস্টিকের পাত্র নিন। ছাতার লোহার শিক ধরনের কিছু, ভালো করে গরম করে নিয়ে পাত্রটির তলায় ৮-১০ টি ও পাত্রের গায়ে ১৫-২০ টি ফুটো করিয়ে নিন। কিছু পাথরকুচি নিয়ে (ভাল করে ধুয়ে) পাত্রটির তলায় ৫ সেমি পুরু করে বিছিয়ে দিন। এর উপর একরাত ভেজানো পুরানো খবরের কাগজভালো করে নিঙড়ে, ছোট ছোট গুলি পাকিয়ে ১৫ সেমি গভীর করে আর একটি স্তর দিন। এবার তৃতীয় স্তরে, আধ পচানো দ্রব্যগুলি (জৈব সামগ্রী) ছড়িয়ে দিন। তবে এই স্তর দেওয়ার আগে (যেহেতু এই সব পচানো জৈব সামগ্রী কিছুটা অম্লধর্মী হয়) ৩-৪ টি ডিমের খোলা ভালো করে গুঁড়ো করে, এই সব জৈব সামগ্রীর সঙ্গে মিলিয়ে দিলে ভালো হয়। এই স্তরের উপর ৫০টির মতো কেঁচো ছেড়ে দিন। সমস্ত স্তর পরপর দেওয়া শেষ হলে, পাত্রটিকে একটি

চটের টুকরো দিয়ে ঢেকে দিন। সপ্তাহে ৩ দিন, ১ কাপ করে জল দিতে হবে। ৪৫-৬০ দিনের মধ্যে সার তৈরি হয়ে যাবে। যদি আধ পচানোর কাজ ঠিকঠাক না হয়, তবে কেঁচোগুলো ভিতরে ঢুকবে না। তখন কেঁচোগুলো তুলে নিয়ে আরও ৭ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এভাবে ৫০টি কেঁচো দিয়ে শুরু করলে কম্পোস্ট তৈরি হতে লাগবে ২ মাস সময়। কিন্তু পরের বারে কেঁচোর সংখ্যা বেড়ে গেলে ১ মাস অন্তর, তৈরি সার পাওয়া যাবে।

প্লাস্টিকের গামলা ছাড়াও একইভাবে, আমরা ফলের বাকসো (কাঠের), বালতি, জলের পাত্র, মাটির বড় টব, পড়ে থাকা ব্যাটারির খোল ইত্যাদি ব্যবহার করেও এই সার তৈরি করতে পারি। আধ পচানো জৈব উপাদানের 'মাধ্যম'-এর জোগানের উপর নির্ভর করে আমরা পাত্রের আকার ছোট-বড় নানা ধরনের করতে পারি।

২. বড় আকারে বাড়ির বাইরে বা খামারে

বর্ষার জল বা রোদ আসার সম্ভাবনা নেই এমন জায়গায় দুরকমভাবে এই সার তৈরি করা যায়। প্রথমত আয়তাকার ইটের চৌবাচ্চা তৈরি করে। দ্বিতীয়ত মাটিতে আয়তাকার গর্ত খুঁড়ে। দুই প্রক্রিয়ারই সুবিধে ও অসুবিধে দুটোই আছে। চৌবাচ্চায় পালন করা হলে প্রক্রিয়াটি পুরোপুরি আমাদের তদারকিতে থাকে। এক্ষেত্রে যদি কোনও কারণে 'মাধ্যম'টি কেঁচোর উপযুক্ত না হয় তাহলে বেশিরভাগ কেঁচোই মরে যেতে পারে। আবার মাটিতে গর্ত করে কেঁচো পালন পুরোপুরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। তবে 'মাধ্যম'টি কেঁচোর অনুপযোগী হয়ে গেলে কেঁচো পাশের মাটিতে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে।

ইটের চৌবাচ্চায় কেঁচোসার

৮ ফুট লম্বা x ৪ ফুট চওড়া ও ২ ফুট গভীরতার একটি চৌবাচ্চা তৈরি করুন। চৌবাচ্চা একের বেশিও তৈরি করা যায়, তবে তা নির্ভর করে জৈব সামগ্রীর কতটা জোগান আছে তার ওপর। চৌবাচ্চার দেওয়ালের একদম নিচের দিকে ৮ মিলিমিটার বা কোয়ার্টার ইঞ্চি মাপের কয়েকটি ছোট ছোট ফুটো রাখা দরকার, যাতে বাড়তি জল বেরিয়ে যায় ও বাতাস চলাচল সহজহয়। এবার চৌবাচ্চাটি ভালভাবে ধুয়ে নিন। তলায় ৬ সেমি পুরু করে নুড়ি পাথর ছড়িয়ে, তার উপরে ২ সেমি পুরু মোটা বালির স্তর তৈরি করুন। এবার এর উপরে ১০ সেমি পুরু করে উর্বর মাটি ছড়িয়ে দিন। পরের স্তরে কেঁচোর খাদ্যপোযোগী, আগে তৈরি আধপচানো কম্পোস্ট বা আধপচা জৈব সামগ্রী দিয়ে, ৪ থেকে ৫ সেমি উপর দিকে খালি রেখে চৌবাচ্চাটি ভরে দিন। যদি 'মাধ্যম'এর আর্দ্রতার পরিমাণ কম হয় তাহলে জল কিছুটা ছড়িয়ে আর্দ্রতা ৪০ শতাংশে নিয়ে আসুন। এবার (আধ পচানো জৈব সামগ্রী কেজি পিছু হিসেব) ২০-৩০টি পরিণত কেঁচো ছেড়ে দি। সব কটি স্তর তৈরি হয়ে এলে উপরে একটি ভেজা চটের টুকরো দিয়ে ঢেকে দিন। সপ্তাহে ২ দিন অল্প করে জল ছড়িয়ে দিন, যাতে আর্দ্রতা ঠিক থাকে। এইভাবে ৩০-৪৫ দিনে কেঁচোসার তৈরি হয়ে যাবে। উপাদানের হেরফেরে কখনও কখনও ৬০ দিনও লাগতে পারে। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে পালনের ক্ষেত্রেও পদ্ধতি একই হবে।

কেঁচো সার তৈরির আরও এক উপায়

কৃষি খামারে কেঁচোসার

ছায়াযুক্ত একটি জায়গা বেছে নিন যেখানে বর্ষায় জল জমে না। জায়গাটি পরিষ্কার করুন। যদি পাথর, প্লাস্টিক, কাচ ইত্যাদি অদরকারি ক্ষতিকর জিনিস থাকে তবে তা বেছে ফেলে দিন। এবার ওই জায়গায় মাটির উপরে ২০-২৫ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট চওড়া বেড বানান। বেডের সংখ্যা একের বেশি হতে পারে, তবে তা নির্ভর করে ওই খামারে কেঁচোসারের জন্য প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থের জোগানের উপর। বেডের উপরে ৭-৮

সেমি পুরু করে শক্ত জৈব সামগ্রী (যেমন ফসলের অবশেষ, আগাছা প্রভৃতি) কুচি কুচি করে কেটে একটি স্তর দিন। তার ওপর একই উচ্চতায় আধপচানো খামার সারের (FYM) আর একটি স্তর গড়ে দিন। এবার অল্প জল ছড়িয়ে, কম্পোস্টউপাদানের আর্দ্রতা (৪০ শতাংশ) ঠিক করে নিন। এর পরের স্তরে ২ সেমি পুরু করে কেঁচো ও কিছুটা (আগে সংগ্রহ করা) কেঁচোসার (ডিম, বাচ্চা ও বড় কেঁচোসহ) দিতে হবে। শেষ ধাপে খামারের জৈব আবর্জনা, আগাছা, শাকসবজির পাতা ইত্যাদি টুকরো টুকরো করে কেটে, অল্প কাঁচা গোবর জলে মিলিয়ে ২০-৩০ সেমি-এর আর একটা স্তর দিন। স্তর দেওয়া শেষ হলে ভিজেচটের বস্তা, নারকেল পাতা বা খড় দিয়ে বেডটি ঢেকে দিন। প্রয়োজনমতো সপ্তাহে (৭ দিনে) ১-২ বার জল ছিটিয়ে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ৪০ শতাংশ আর্দ্রতা বজায় থাকে। ৪৫-৬০ দিনের মধ্যে সার তৈরি হয়ে যাবে।

● ইঁদুর, মুরগি ও পিঁপড়ের থেকে রক্ষার ব্যবস্থা

কেঁচো চাষের জায়গাটিকে ইঁদুর, মুরগি ও পিঁপড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা দরকার। এক্ষেত্রে, লংকা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো ও নুন ১০০ গ্রামের মতো নিয়ে ১০ লিটার জলে গুলে, গর্ত বা চৌবাচ্চার চারপাশে ৭-১০ দিন অন্তর স্প্রে করলে পিঁপড়ের উপদ্রব কমবে। হাঁস, মুরগি ও অন্য পাখির উপদ্রব থেকে বাঁচতে বাঁশের তৈরি বরফির বেড়া ভাল কাজ দেয়।

কেঁচোসার সংগ্রহ

সার তৈরি শুরুর ৬-৮ সপ্তাহ পর উপরের স্তরের সমস্ত জৈব সামগ্রী পচে যাবে। রংহবে হালকা বা গাঢ় বাদামি, অনেকটা গুঁড়ো চায়ের মতো। এই অবস্থায় পৌঁছোলে ২-৩ দিন জল দেওয়া বন্ধ রাখুন। এরপর নারকেল পাতা, খড়-এর ঢাকনা সরিয়ে, সার তুলে নিয়ে ছোট ছোট ঢিবি করে দুদিন রেখে দিন। ফলে ঢিবির সার শুকিয়ে আসবে ও বাইরে থেকে আলো আসার ফলে, আলোকে এড়াতে কেঁচোগুলো ঢিবির নিচে চলে যাবে। তখন উপর থেকে সারের অংশ তুলে নিয়ে, বাকি আধপচা কম্পোস্টউপাদান ওই বেডের উপরে দিয়ে, নতুন করে আবার এই সার তৈরি শুরু করা যাবে। এছাড়া আরও এক পদ্ধতি আছে। প্রথমে সমস্ত সার তুলে নিয়ে একটি পলিথিনের মধ্যে রেখে দুদিন ছায়াতে শুকিয়ে নিন। এরপর ৩ মিলিমিটার ছিদ্রের একটি চালনিতে চেলে নিন। চেলে নেওয়া সারের ভেতর থাকবে কেঁচোসার আর কোকুন। আর কেঁচো যেগুলি চালনিতে থেকে গেল, সেগুলি নিয়ে আবার নতুন করে কম্পোস্ট উপাদান দিয়ে বেডে ছেড়ে দিন।

কেঁচোসারের ব্যবহার

যে কোনও গাছ বা ফসলে এই সার দারুণ কার্যকারী। কার্যকারিতা আরও বাড়াতে হলে, এই সারের সঙ্গে জীবাণুসার মিশিয়ে (অনুপাত অনুযায়ী) ১-২ দিন ছায়াতে রেখে জমিতে ব্যবহার করুন।

বিভিন্ন জমিতে ও গাছে কেঁচোসার ব্যবহারের পরিমাণ:

নার্সারি

ছোট ছোট পাত্রে অথবা মাটির বেডে বীজ, কাটিং প্রভৃতি লাগানোর ক্ষেত্রে ১ভাগ কেঁচোসার, ৩ ভাগ মাটির সঙ্গে মেশাতে হবে।

শস্য ও সবজি

এক্ষেত্রে দুবার এই সার প্রয়োগ করলে ভাল হয়। প্রথমে মাটি তৈরির সময় ও পরে ফসল বোনার সময়। প্রথমবার একর প্রতি ১ হাজার কেজি, সম পরিমাণ উচ্চতাপ কম্পোস্ট বা খামার সার-এর সঙ্গে মিশিয়ে দুদিন ছায়াতে রেখে। আর দ্বিতীয়বার ফসল বোনার ৪৫ দিন পর, আরো ১ হাজার কেজি চাপান হিসেবে।

ফল, ফুল ও অন্যান্য বড় গাছ

গাছের বয়স ও গড়ন অনুযায়ী গাছ প্রতি ২-৫ কেজিপর্যন্ত দিতে হবে। গাছের গোড়া থেকে ২-৩ ফুট দূরে, বৃত্তাকারে ৬-১২ ইঞ্চি গভীর গর্ত করে। কেঁচোসার ও কম্পোস্টবা গোবর সার মিশিয়ে গর্ত ভর্তি করে মাটি দিয়ে চাপা দিতে হবে। বর্ষার কিছুদিন আগে এই সার দিলে গাছে জল দিতে হবে না। কিন্তু অন্য সময়, পরিমাণমতো জল খুব জরুরি।

কয়েকটি সাবধানতা :

১. কম্পোস্টে কেঁচোর খাদ্য হিসেবে পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ সবসময় রাখতে হবে। কারণ খাবার শেষ হলেই কেঁচো পালাবার চেষ্টা করে।
২. আর্দ্রতা রক্ষার জন্য নিয়মিত জল দিতে হবে। তবে কখনই পরিমাণের বেশি নয়। মোটামুটি ৪০-৫০ শতাংশ আর্দ্রতা বজায় রাখতে হবে।
৩. কেঁচোকে আটকে রাখতে ঢাকনার ব্যবস্থা রাখা দরকার। বাকসো বা চৌবাচ্চার ক্ষেত্রে দেওয়াল অনেকটা উঁচু করতে হবে।
৪. তাপমাত্রা কম বেশি ১৫- ২৫০ সেলসিয়াস-এর মধ্যে রাখতে হবে। রোদ, বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে কোনো ছাউনির তলায় সার তৈরির কাজ করতে হবে। ভেজা চট দিয়ে ঢেকে রাখলে ভাল হয়।
৫. রাসায়নিক সার বা ওষুধ দেওয়া চলবে না।
৬. মনে রাখা দরকার, কেঁচো পালন প্রক্রিয়াটির সাফল্য অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেগুলি স্থান ও সময়ভেদে বদলে যেতে পারে।

আপনার বাড়ির বাগানে বা টবে যদি সবজি ফলাতে চান, বা ফুলের গাছ, তবে এভাবেই আপনি সার তৈরি করে নিতে পারেন। যা আপনার গাছকে পুষ্ট করবে, রোগ ও পোকার আক্রমণ কমিয়ে দেবে, কমিয়ে দেবে আপনার খরচাপাতি। অন্যদিকে আপনার হাতের কাছেই মিলে যাবে বিষমুক্ত পুষ্টি।

বীজ

বীজের ধরন

বীজ থেকে গাছ বা ফসল জন্মায়, এ কথা কে না জানে? কিন্তু সব বীজ তো এক রকমের হয় না। এদেরও বিভিন্ন ধরন আছে। তাদের নাম, সুবিধা, অসুবিধা - এগুলো না জানলে, তাদের ব্যবহার করব কী করে? নীচে বিস্তারিত ভাবে দেওয়া হল।

বীজের ধরন	উদাহরণ	সুবিধা	অসুবিধা
দেশি বীজ	গোড়া ধান, কবিরাজশাল, ভুতমুড়ি, ঝুলুর, মুগাই, দুধেশ্বর ইত্যাদি	■ বীজ রাখা যায় ■ রোগপোকা কম লাগে। ■ স্থানীয় আবহাওয়া ও প্রতিকূলতা সহ্য করতে পারে। ■ উদ্ভিদ খাদ্যের চাহিদা অনেক কম।	ফলন সামান্য কম
উচ্চফলনশীল বীজ	ধান-আই আর ৮, ঢেঁড়শ ইত্যাদি পঙ্কজ ও শ্রাবণী	■ প্রচলিত জাতের থেকে বেশি ফলন পাওয়া যায়। ■ রোগপোকা বেশি লাগে। প্রচুর রাসায়নিক সার লাগে।	স্থানীয় আবহাওয়া ও প্রতিকূলতা সহ্য করতে পারে না
সংকর বীজ	টমেটো - অবিনাশ ২ বাঁধাকপি -কে কে ক্রশ, গ্রীন এক্সপ্রেস প্রভৃতি	■ প্রচলিত জাতের থেকে বেশি ফলন পাওয়া যায়।	■ বীজ রাখা যায় না। ■ ঝুঁকি বেশি। ■ স্থানীয় আবহাওয়া ও প্রতিকুলতা সহ্য করতে পারে না। ■ প্রচুর রোগ পোকা লাগে। ■ রাসায়নিক সার ও বিষ অধিক প্রয়োজন।
জিন কারিগরি	বিটি বেগুন, গোল্ডেন বীজ, রাইস, রাউন্ড আপ	পরীক্ষিত নয়	■ দাম অনেক বেশি ■ সঠিক পরীক্ষা নিরীক্ষার ফসল আগে কৃষকের হাতে দেওয়া হচ্ছে।

বীজ উৎপাদনের স্তর অনুযায়ী বীজের শ্রেণীবিভাগ : -

১. পরিবর্ধক বীজ
কৃষি বিজ্ঞানীরা যখন কোনো ফলের বিশেষ জাত তৈরি করেন, সেই বীজই হল পরিবর্ধক বীজ।

২. আধারীয় বীজ
পরিবর্ধক বীজ থেকে উদ্ভিদ প্রজননবিদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরবর্তী স্তরে বীজ বাড়িয়ে নেওয়া হয়। একে আধারীয় বীজ বলে।

৩. শংসিত বীজ
আধারীয় বীজ থেকে পরবর্তী স্তরে চাষ করার জন্য যে যে বীজ তৈরি করা হয় তাকে শংসিত বীজ বলে। এই বীজ কৃষক কিনে এনে চাষ করতে পারে।

বীজ কীভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবেন?

বীজের নানা ধরন ধারণ তো বোঝা গেল। কিন্তু বীজ যদি সঠিকভাবে যোগাড় করা না যায়, আর তারপর তাদের ঠিকভাবে রক্ষা করা না যায়, তবে তো সবই মাটি! কীভাবে করব সেই কাজ? জেনে নেওয়া যাক -

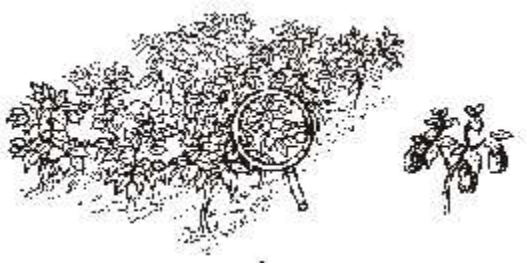

১। সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত গাছ থেকেই বীজ সংগ্রহ করা উচিত। যে ফল থেকে বীজ নেওয়া হবে সেটি যেমন সুস্থ ও প্রমাণ আকারের হয়।

২। সঞ্চিত খাবারের পরিমাণ কম হলে বীজের জীবনীশক্তি কমে যায়। আবার বেশি হলে পোকা লাগার ভয় থাকে। অতএব মাঝারি আকারের বীজ বাছাই করতে হবে।

৩। বহুবর্ষীয় গাছের ক্ষেত্রে গাছের জীবনচক্রের অন্তত ১/৩ ভাগ পেরোনোর পর সেই গাছের বীজ সংগ্রহ ও ব্যবহার করা উচিত।

৪। দানা শস্যের ক্ষেত্রে, অনেক বীজের মধ্যে গড়ে স্বাভাবিক রঙের বা আকারের যে বীজ সেগুলিকে সঠিক গড়ন বা রং ধরে নিয়ে তার সাথে মিশিয়ে বীজ বাছাই করতে হবে।

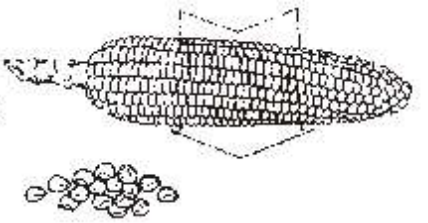

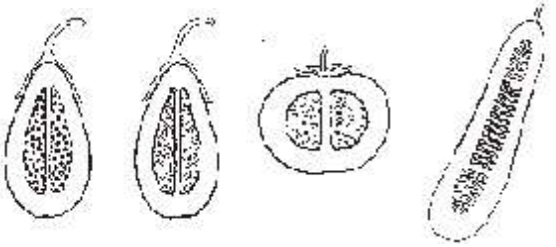

৫। শাঁসালো ফসল যেমন টমেটো, বেগুন, শশা, লেবু ইত্যাদির ফলগুলিকে গাছেই ভালোভাবে পাকতে দেওয়া হয়। পাকা ফলের বীজসহ শাঁসালো অংশকে চামচ দিয়ে আলাদা করে নেওয়া হয়।

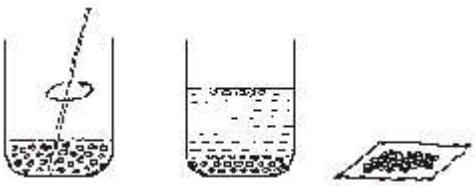

৬। শাঁসটিকে একই পরিমাণ জলের মধ্যে এক-দুদিন ভিজিয়ে রাখা হয়, প্রতি দিন তিন-চার বার নাড়ানো হয়। শাঁস ও হালকা বীজগুলি আলাদা হতে শুরু করলে বেশি জল দেওয়া হয় ও শুধু ভারি বীজগুলিকে আলাদা করে শুকিয়ে নেওয়া হয়।

৭। প্রথমে কয়েক ঘণ্টা খবরের কাগজের ওপর রেখে অতিরিক্ত জল ঝরে যাওয়ার পর বাঁশের ঝুড়ি বা কুলোর ওপর দিয়ে বাতাস চলাচল করে এমন ছায়া জায়গায় রাখা হয়।

৮। ৭-১০ দিন শোকানোর পর কাগজের ঠোঙায় ভরে, প্যাকেটগুলি কাচের বোতল বা চিনেমাটির পাত্রে রাখা ভালো। একটি পুঁটলিতে কিছু চাল ভাজা বা কাঠকয়লার টুকরো বেঁধে সেটিও সঙ্গে দিয়ে রাখলে বীজ শুকনো থাকে।

৯। করলা, কুমড়ো, চিচিঙ্গার ক্ষেত্রে পাকা ফলের বীজ জলে ধুয়ে আঠালো ভাব দূর করতে হবে। জল ঝরিয়ে ছাইয়ে ঘষে, ৫-৭ দিন শুকিয়ে নেবার পর সংরক্ষণ করতে হবে।

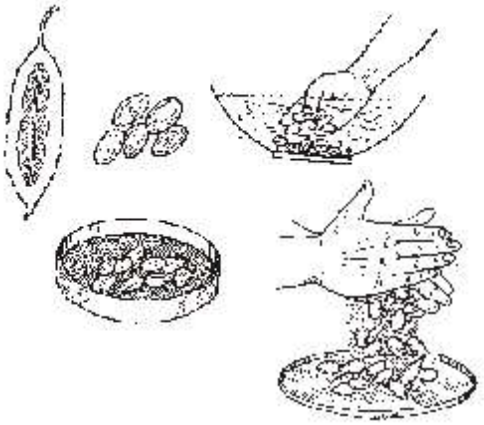

১০। পাকা কুমড়ো, চালকুমড়ো ও ৫-৬ মাস রেখে দেওয়া যায়।

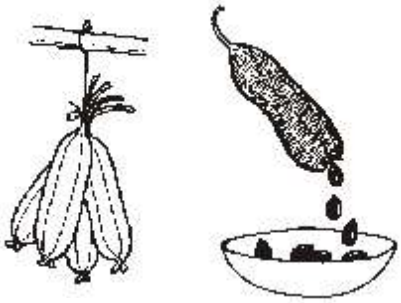

১১। লঙ্কা, ধুধুল, ঝিঙে, ঢেঁড়শ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ফল পেকে শুকিয়ে গেলে পুরোটাই সংরক্ষণ করে রাখা হয়। পরে, লাগানোর সময় ফল ভেঙে বীজ বের করা হয়।

১২। শুঁটিজাতীয় সবজির বীজ প্রায় পেকে গেলে ডালশুদ্ধ গাছ থেকে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে তার নীচে একটা বাটি গামলার মধ্যে পড়ে। যাতে পাকা শুঁটি ফেটে গেলে বীজগুলি ওই পাত্রের মধ্যে পড়ে,গাছেই ফেটে না যায়। কেননা শুঁটি ফেটে গেলে বীজগুলি ছড়িয়ে পড়ে। শুঁটিগুলি জোর করে ফাটানো উচিত নয়, নিজে থেকে ফেটে গেলে তবেই বীজ সংগ্রহ করা উচিত।

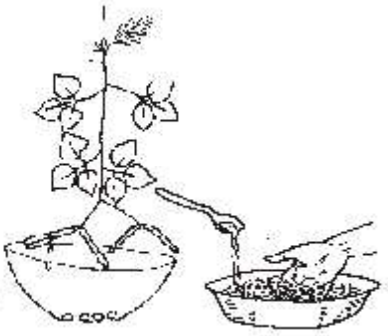

১৩। বীজ শুকিয়ে নেওয়ার পদ্ধতি একই, তবে ৮-১০ দিন সময় লাগে। বীজ শুকিয়ে নেওয়ার পর, ৫০০ গ্রাম বীজ প্রতি ১ চা চামচ তেল (নিম, সরষে, করঞ্জ বা অন্য ঝাঁঝালো তেল) মাখিয়ে,কাঁচের বোতলে ভর্তি করে ভালোভাবে মুখ বন্ধ করে রাখতে হবে।

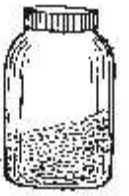

১৪। শাকের বীজ সংগ্রহ করতে গেলে হাওয়া চলাচল করে এমন পাতলা কাপড়ের একটা ব্যাগের মধ্যে শাকের গাছ রাখতে হবে যাতে গাছ শুকোনোর সাথে সাথে বীজ ধীরে ধীরে ন্যাকড়ার মধ্যে ঝরে পড়ে।

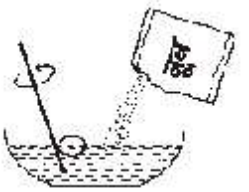

১৫। ধানের বীজ লবন জলে বাছাই করা হয়। প্রয়োজনমতো জল নিয়ে তাতে একটি মুরগির গোটা ডিম ফেলে দিতে হবে। দেখা যাবে ডিম জলের নীচে ডুবে গেছে। এরপর যতক্ষণ না ডিমটি জলের উপর ভেসে ওঠে ততক্ষণ পর্যন্ত লবন দিতে হবে এবং নাড়তে হবে। ডিম ভেসে উঠলে সেই দ্রবণে ধানের বীজ ফেলে দিতে হবে, যেগুলি ভেসে উঠবে এবং জলের মধ্যে থাকবে। সেগুলি বাদে পাত্রের নীচে পড়ে থাকা বীজগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়।

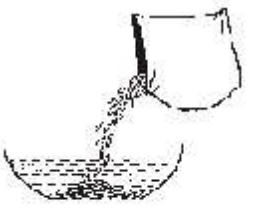

১৬। বীজ ধান বাছাই করা হয়ে গেলে তাজা গোমূত্রের সাথে ৩-৪ গুণ জল মিশিয়ে অন্তত ৪ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখতে হবে। লবন জলে বাছাই ধান তরলসারে ৫-৬ ঘণ্টা ডুবিয়ে নিয়ে রোপণ করলে বীজের জীবনীশক্তি বেড়ে যায়, যার ফলে বীজ থেকে সুস্থ সবল চারা বেরিয়ে আসে।

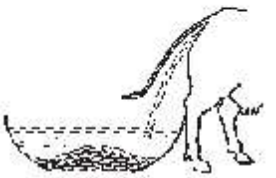

১৭) যে পাত্রে বীজ রাখা হবে, তার গায়ে বা ভিতরে গাছ/ফসলের নাম, কোন জায়গা থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়েছে ও কোন তারিখে সংগ্রহ করা হয়েছে, এইগুলি লিখে রাখতে হবে।

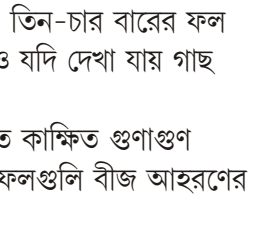

বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

- গাছের প্রথমদিকের ফল বা শেষ ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করা উচিত নয়। তিন-চার বারের ফল খাওয়ার পর বীজের ফলন বাছাই করতে হবে। বীজ সংগ্রহ করার পরে ও যদি দেখা যায় গাছ রোগাক্রান্ত তবে সেই গাছ থেকে রাখা বীজ নষ্ট করে দিতে হবে।
- বীজ সংগ্রহ করবার সময় শুধু বড়ো ফল দেখলে হবে না। যে গাছগুলিতে কাঙ্ক্ষিত গুণাগুণ আছে, সেগুলি বেছে নিয়ে, তারপর ওই সব গাছের ঝাঁঝারি ও সুডৌল ফলগুলি বীজ আহরণের জন্য বাছতে হবে।

- বীজ একবার শুকনো করার পর যাতে আবার ভিজে না যায় সেটা লক্ষ্য রাখা দরকার।
- কোনও একটি গ্রামে কোনও একটি ফসলের বীজ সংগ্রহের কাজ একজনকে দিয়েই করানো উচিত নয়। একজনের ব্যর্থতাতে সমস্ত চেষ্টাই নষ্ট হয়ে যায়। তাই কমপক্ষে ২-৩ জনের একই বীজ সংগ্রহের কাজ করা উচিত। শুধু একটি বা দুটি গাছ থেকে বীজ নেওয়া উচিত নয়।
- কড়া রোদে সবজির বীজ শুকোনো উচিত নয়। দানা শস্যের বীজ সকালের নরম রোদে (সূর্য ওঠার ঘণ্টা খানেক পর শুকোতে হবে ।

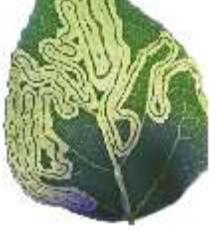

জৈব নিবিড় রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ

ফসল হচ্ছে, কিন্তু তাতে কখনও রোগ পোকা হয়নি, এমনটা খুঁজে পাওয়া কঠিন। প্রকৃতির নির্দিষ্ট হিসেবনিকেশ এলোমেলো হয়ে গেলে রোগপোকার বাড়াবাড়ি শুরু করে। তাই আমরা এমনভাবে এই রোগ পোকাদের তাড়াব, যাতে প্রকৃতির হিসেবনিকেশ কিছুতেই গোলমাল না হয়।

এখন সাধারণভাবে রোগপোকা মারতে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তাতে অনেকগুলো সমস্যা আছে -

- রোগ পোকারা দিনে দিনে রাসায়নিক ওষুধ সহ্য করে ফেলছে ।
- রাসায়নিক ওষুধগুলো ফসলের শত্রুদের পাশাপাশি ফসলের বন্ধুদেরও মেরে ফেলছে।
- রাসায়নিক ওষুধগুলোর কিছুটা ফসলের কাজে লাগলেও বাকিটা জলবাতাস এর সঙ্গে মিশে প্রকৃতির হিসেবনিকেশ গোলমাল করে দিচ্ছে।

এই জন্যই আমরা রাসায়নিকের বদলে জৈব পদ্ধতিতে রোগপোকা তাড়াতে চাই জৈব নিবিড় রোগপোকা নিয়ন্ত্রণের উপকারিতা

- এই পদ্ধতিতে দীর্ঘ সময়ের জন্য সুফল পাওয়া যায় ।
- এই ব্যবস্থা পরিবেশকে সুন্দর রাখে এবং উপকারী জীবদের বাঁচিয়ে রাখে।
- রোগপোকা বড় সমস্যা তৈরি করার আগেই তা চিনে ফেলা যায়।
- চারপাশের সবার সঙ্গে মিলেমিশে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়।
- উৎপাদনের খরচ কমে যায় তাই কৃষকেরা বেশি লাভবান হতে পারেন।

ফসলের ক্ষতিকর জীব বলতে বোঝায়

- যারা গাছের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আকার প্রভৃতির ক্ষতিসাধন করে থাকে ।
- যারা ফসলের জন্য দরকারি আলো, জল ও খাদ্য কেড়ে নিতে চায়।
- ফসলের নানারকম অসুখ বাড়ায়।

ফসলের রোগপোকা নিয়ন্ত্রণে যে যে বিষয়ে আমাদের ভালো ভাবে জানা দরকার

১। রোগপোকার আবাস বা বাসস্থান
২। শরীরের গঠন
৩। জীবনচক্র
৪। খাদ্যাভ্যাস
৫। অর্থনৈতিক ক্ষতির দিক
৬। সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

পোকার আক্রমণে আর রোগে নষ্ট হয় সবজি, ধান, ডালশস্য আর তেলশস্য। তাই পোকা আর রোগ - দুইই চিনে নেওয়া খুব জরুরি। সঙ্গে অবশ্যই জানতে হতে তাদের মারার বা সারাবার উপায়।

সবজি পোকা

পোকা
কুমড়ো পোকা

চিনব কী দিয়ে
চারা থেকে ফুল আসা পর্যন্ত এই পোকা ফসলের ক্ষতি করে থাকে। কালচে লাল,বাদামি রঙের পূর্ণাঙ্গ পোকা বীজপত্র, কচিপাতা, ফুল খেয়ে ফেলে। এরা মাটিতে ডিম পাড়ে ওই ডিম ফুটে পোকাগুলি গাছের শিকড় ও কাণ্ডের অংশ খেতে শুরু করে।

পোকা জব্দ করার উপায়
আক্রমণের প্রথমে পোকার ডিম ও কীড়া তুলে নষ্ট করে দিতে হবে।
• নিমপাতার দ্রবণ • নিমতেলের দ্রবণ • নিমবীজের দ্রবণ • নিম, তুঁতে, সোহাগার দ্রবণ • তামাক পাতার দ্রবণ

বাঘা পোকা
চিনব কী দিয়ে
পূর্ণাঙ্গ পোকার রঙ হল লাল বা কমলা এবং ডানার উপরে কালো টিপ দাগ থাকে। পূর্ণাঙ্গ এবং কীড়া পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ঝাঁঝরা করে দেয়।

আক্রমণের প্রথমে পোকার ডিম ও কীড়া তুলে নষ্ট করে দিতে হবে।
• নিমপাতার দ্রবণ • নিমতেলের দ্রবণ • নিমবীজের দ্রবণ • নিম, তুঁতে, সোহাগার দ্রবণ • তামাক পাতার দ্রবণ।

ফলের মাছি
চিনব কী দিয়ে
এই মাছি কচি ফলের মধ্যে ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে কয়েক ঘন্টা সময় লাগে।
মাছির পোকা ফল খেতে শুরু করলে ফল পচে যায় এবং ঝরে পড়ে যায়।

পোকা জব্দ করার উপায়
• নিম, তুঁতে, সোহাগার দ্রবণ • তুলসী পাতার দ্রবণ • নিমবীজের দ্রবণ

নালি পোকা বা ম্যাপ পোকা
চিনব কী দিয়ে
মা পোকা পাতায় হুল ফুটিয়ে দু-ত্বকের মাঝখানে ডিম পেড়ে দেয়। ওই ডিম ফুটে পাতার ভিতরেই কীড়া জন্মায়। অতি ক্ষুদ্রাকার কীড়া পাতার মধ্যে সবুজ ক্লোরোফিল খেতে খেতে এগিয়ে চলে এবং পাতার উপরে ম্যাপের

মতো একটা সাদাটে দাগ তৈরি হয়ে যায়। তাই একে কৃষকের ভাষায় ম্যাপ পোকা বলা হয়। টমেটো ও লঙ্কাতে এই পোকার আক্রমণ গ্রীষ্মকালে অধিক মাত্রায় দেখা যায়।

পোকা জব্দ করার উপায়

• নিমবীজের দ্রবণ • নিমতেলের দ্রবণ • নিমপাতার দ্রবণ • নিম, তুঁতে, সোহাগার দ্রবণ

কুমড়ো জাতীয় ফসলের লতার ডগা মোটা হয়ে যায়

চিনব কী দিয়ে

এক ধরনের শোষকপোকা রস চুষে খাবার পর ডগা এমনভাবে ফুলে মোটা হয়ে যায়। এর ফলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায়, পাতা ছোটো হয়ে যায়।

পোকা জব্দ করার উপায়

শোষক পোকার আক্রমণের আগে নিম্নলিখিত দ্রবণগুলি প্রয়োগ করতে হবে

• নিমতেলের দ্রবণ • নিম, তুঁতে, সোহাগার দ্রবণ • আদা, রসুন ও লঙ্কার দ্রবণ

শ্যামাপোকা

চিনব কী দিয়ে

পাতার নীচে বসে খুব ছোটো ছোটো সবুজ পোকা পাতার শিরা থেকে রস চুষে খায়। পাতার রস চুষে খাবার সময় পোকার বিষাক্ত নানা গাছের পাতা সংক্রমিত করে দেয়, ফলে পাতার কিনারা বরাবর হলুদ রঙ ধারণ করে, পাতা বিবর্ণ হয়ে যায়, পাতার কার্য্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়।

ফল ও কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা

চিনব কী দিয়ে

একরকম মথের লেদা পোকা দ্বারা গাছ আক্রান্ত হয়। লেদা পোকা ফল ও কাণ্ড ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করে। ফল ও কাণ্ডের নরম অংশ খেতে থাকে । গাছের কাণ্ড ও ডগা প্রথমে ঝিমিয়ে যায় ও পরে শুকিয়ে যায় এবং ফল পচে নষ্ট হয়ে যায়।

- বেগুনের বীজতলা তৈরির সময় বীজতলাতে এবং চারা রোপণের সময় প্রতি মাদাতে নিমখোল রোপণের ৪০-৪৫ দিন পর থেকে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে যাতে পূর্ণাঙ্গ পোকা ক্ষেতে না বাড়তে পারে।
- ট্রাইকোগামা চিলোনিস নামক বন্ধু পোকার ডিম বিঘাপ্রতি ৬০০০-৭০০০ টি ছাড়লে শত্রু পোকা নিয়ন্ত্রণে থাকে।
- প্রতি ১০ লিটার জলে ১৫-২০ গ্রাম বিটি কালচার গুলে গাছে স্প্রে করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

মাকড়

চিনব কী দিয়ে

পাতার নীচে বসে হলদে ও লাল মাকড় রস চুষে খায়। এদের আকার এতো ছোটো যে পাতা উল্টে খুব ভালো করে দেখলে তবেই দেখা যায়। এদের আক্রমণে পাতার রঙ তামাটে হলদে হয়ে যায় এবং গাছ খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। গ্রীষ্মকালে এদের আক্রমণ সবচেয়ে বেশি হয়।

পোকা জব্দ করার উপায়

• নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ সারের ব্যবহার করাতে হবে। • পোকা আক্রমণের শুরুতে বরফ মেশানো ঠান্ডা জল স্প্রে করলে পোকার আক্রমণ করে যায়। • ক্রাইসোর্পাণা নামক একপ্রকার বন্ধু জীবাণু গড়ে গাছ প্রতি ২টি করে ছাড়া যেতে পারে। • বিউভেরিয়া নামক ছত্রাক প্রতি ১০ লিটার জলে ২০-২৫ গ্রাম গুলে স্প্রে করা যেতে পারে। • নিমতেলের দ্রবণ • আদা, রসুন ও লঙ্কার দ্রবণ • নিম, তুঁতে, সোহাগার দ্রবণ • তামাক পাতার দ্রবণ।

দয়ে পোকা

চিনব কী দিয়ে

সাধারণত নরম কাণ্ড ও পাতাতে এই পোকার আক্রমণ দেখা যায়। গোলাপি- সাদা রঙের পোকা দলবদ্ধভাবে তুলোর মতো গাছের গায়ে বসে রস চুষে খায়।

পোকা জব্দ করার উপায়

• আক্রমণের শুরুতে আক্রান্ত অংশ কেটে ফেলে দিতে হবে। • ক্রাইসোর্পালা নামক ২৫০টি বন্ধু পোকা প্রতি ১০০ টি গাছের জন্য ছাড়া যেতে পারে। • বিউভেরিয়া/লিটার রহিজিয়া নামক ছত্রাক প্রতি ১০ লিটার জলে ২০ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে। • তিতো, আঠা ও গন্ধযুক্ত পাতার দ্রবণ • আদা, রসুন ও লঙ্কার দ্রবণ • নিমতেলের দ্রবণ • নিমবীজের দ্রবণ।

কোন সবজিতে কি কি ধরনের রোগ হয়

কুমড়ো জাতীয় ফসলে যে ধরনের রোগ হয়

রোগ

হলদে মোজাইক ভাইরাস, নিমাটোড, লতার ডগা মোটা হওয়া, কাণ্ড ফেটে যাওয়া, পাতা হলদে দাগ, সাদা পাউডার রোগ, ঢলে পড়া,পাতা বাদামি দাগ।

কপি জাতীয় সবজির রোগ

রোগ

ম্যাপ পোকা, হলদে মোজাইক ভাইরাস, সাদা পাউডার রোগ, ব্যাক্টেরিয়াজনিত পাতার দাগ রোগ, কালচে দাগ রোগ, ঢলে পড়া, কপি ও কাণ্ড পচা, কালো শিরা রোগ, ফাঁপা কাণ্ড, কপি ফেটে যাওয়া, চারা ঢলা।

শুঁটি জাতীয় সবজির রোগ

রোগ

হলদে মোজাইক দাগ, পাউডার রোগ, পাতা ও ফলে দাগ, ব্যাক্টেরিয়া জনিত পাতায় দাগ, মরচে দাগ, গোড়া পচা প্রভৃতি।

বেগুন জাতীয় সবজির রোগ

রোগ

কৃমি বা নিমাটোড, ফল ও পাতা পচা, ব্যাক্টেরিয়া জনিত ঢলে পড়া, গোড়া পচা, তুলসী রোগ, চারা ঢলা রোগ, নাবি ও জলদি ধসা, পাতা কোকড়ানো ভাইরাস, ছত্রাকজনিত ঢলে পড়া।

মূল ও কন্দজাতীয় ফসলের রোগ

রোগ

পাতায় দাগ, মুলোর কুটে, কন্দের ভিতরের অংশ পচা, চারা ঢলা, শিকড় ফোলা, পাতা ধ্বসা, গোড়া পচা, ব্যাক্টেরিয়া জনিত ঢলা, আলু ফেটে যাওয়া, শিকড় বা কন্দ পচা, মোজাইক রোগ, কালোভূষের প্রভৃতি।

শাকজাতীয় সবজির রোগ

রোগ

পাতায় দাগ, পাউডার দাগ রোগ, চারা ঢলা, সাদা মরচে দাগ, কাণ্ড ফোলা প্রভৃতি।

সবজির রোগ

রোগ

গোড়া ও শিকড় পচা রোগ

চিনব কী দিয়ে

মাটির সঙ্গে লেগে থাকা গাছের কাণ্ড ও শিকড় প্রথমে কালো হয়ে যায়। এরপর খাদ্যের অভাবে গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং গাছ শুকিয়ে মারা যায়। অপকারী ছত্রাকের আক্রমণে সাধারণত এই রোগ হয়ে থাকে।

রোগ তাড়াবার উপায়

• ১০ গ্রাম ট্রাইকোডারমা ভিরিডি দিয়ে প্রতি কেজি বীজ শোধন করতে হবে। • প্রতি বিঘা জমির জন্য ১০ কেজি জৈব সারের সঙ্গে ৫০০ গ্রাম ট্রাইকোডারমা ভিরিডি মিশিয়ে ৪-৫ দিন ছায়াতে রেখে দিয়ে মূল চাষের আগে জমিতে ছড়িয়ে দিয়ে মাটি শোধন করতে হবে। • প্রতি লিটার জলে ১০ গ্রাম ট্রাইকোডারমা কালচার গুলে বিকালে ফসলের পাতায়, কান্ড ও মাটিতে স্প্রে করতে হবে। • কম্পোস্ট টি প্রয়োগ

ছত্রাকজনিত ঢলে পড়া রোগ

চিনব কী দিয়ে

গাছ ঝিমিয়ে ঢলে পড়ে, পাতা হলুদ ও পাতার শিরা উজ্জ্বল রঙের হয়ে যায়। কাণ্ডের ভেতরের জল প্রবাহের নালি বাদামী হলুদ রঙের হয়।

ব্যাক্টেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগ

চিনব কী দিয়ে

ফল, ফুল সহ পূর্ণাঙ্গ সতেজ গাছ হঠাৎ কোনো লক্ষণ ছাড়া ঢলে পড়ে। ক্রমশ গাছ শুকিয়ে মারা যায়। লক্ষণ বোঝার জন্য কাঁচের গ্লাসের মধ্যে পরিষ্কার জল নিয়ে কাণ্ডের কিছুটা অংশ কেটে ডুবিয়ে দিলে কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে জল ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে।

রোগ তাড়াবার উপায়

• প্রতি কেজি বীজের জন্য ১০ গ্রাম ফ্লুওরেসেন্স দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। • এক বিঘা জমির জন্য ১০ কেজি জৈব সারের সঙ্গে ৫০০ গ্রাম ফ্লুওরেসেন্স মিশিয়ে ৪-৫ দিন ছায়া জায়গাতে রেখে মূল জমি তৈরির সময় মাটিতে মিশিয়ে মাটি শোধন করতে হবে। • পেঁয়াজ, রসুন, গাজর প্রভৃতি ফসল দিয়ে মিশ্র চাষ করলে রোগের প্রকোপ কম হয়।

ধবসা রোগ

চিনব কী দিয়ে

এই রোগ সাধারণত দুই প্রকার হয়, নাবি ধ্বসা ও জলদি ধ্বসা রোগের শুরুতে মাটির সঙ্গে লেগে থাকা কাণ্ডে দেখা যায়। পরে নীচের পাতার কিনারা বরাবর বাদামি রঙের দাগ দেখা যায় এবং ক্রমশ দাগ বড় হতে থাকে ও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, পাতা শুকিয়ে যায়।

রোগ তাড়াবার উপায়

• গাঁদা পাতার দ্রবণ • লেমন গ্রাসের দ্রবণ • চুন তুঁতের বোর্দ মিশ্রণ

ফল ফেটে যাওয়া ও উঁচু নীচু দাগ হওয়া

চিনব কী দিয়ে

এই রোগ হলে টাটকা ফল ফেটে যায় যা ফলের গায়ে অস্বাভাবিক কর্কশ দাগ দেখা যায়। এটা বোরনের অভাবে হয়ে যাবে।

রোগ তাড়াবার উপায়

প্রতি ১০ লিটার জলে ২৫ গ্রাম সোহাগা/বোরাক্স মিশিয়ে ফসলে স্প্রে করতে হবে।

ফলের পেছনের দিকে কালো দাগ হওয়া

চিনব কী দিয়ে

এই রোগটি সাধারণত ক্যালসিয়ামের অভাবে হয়ে থাকে। এই রোগ হলে ফলের পেছনের দিকে কালো হয়ে পচে যেতে দেখা যায়। এই রোগটি সাধারণত টমেটোতে হয়ে থাকে।

রোগ তাড়াবার উপায়

১০ লিটার জলে ২০ গ্রাম কলি চুন গুলে ফসলে স্প্রে করলে এই রোগ চলে যায়।

নিমাটোড

চিনব কী দিয়ে

গাছের শিকড়ে ক্ষুদ্র কৃমি প্রবেশ করে শিকড়ে ছোটো ছোটো গুটি তৈরি করে আশ্রয় নেয়। ফলে গাছের খাদ্য সংগ্রহ করতে অসুবিধা হয় তাই গাছ ঝিমিয়ে যায়, ফলন কমে যায়, বৃদ্ধি ভালো হয় না এবং অবশেষে মারা যায়।

রোগ তাড়াবার উপায়

• জমিতে পর্যাপ্ত নিম খোল ব্যবহার করতে হবে এবং নিম পাতা মেশাতে হবে। • বেগুন, লঙ্কা, টমেটোর সঙ্গে গাঁদা ও তুলসী গাছ লাগাতে হবে।

ভাইরাস রোগ

চিনব কী দিয়ে

পাতা হলদে হয়ে কুঁকড়ে ছোটো হয়ে যেতে থাকে, নতুন যে সমস্ত পাতা বের হয় সেগুলিও কুঁকড়ে যায়। গাছ বসে যায়, ফল ফুল কম ধরে। সাদা মাছি বা শ্যামা পোকা আলাদা বা অন্য কোনো আক্রান্ত গাছের রস শুষে সুস্থ গাছের রস খেলে এই রোগের সংক্রমণ ঘটে অথবা ভাইরাস আক্রান্ত গাছের বীজ থেকে পরবর্তীকালে চাষ করলে এই রোগ হয়।

রোগ তাড়াবার উপায়

• আক্রান্ত গাছ তুলে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে সাদামাছি ও শ্যামা পোকা যাতে ফসলে না আসে তার ব্যবস্থা করতে হবে। • তুলসী পাতা ও দুধের দ্রবণ।

কুমড়ো / শশার কাণ্ড ফেটে যাওয়া

চিনব কী দিয়ে

বোরনের অভাবে এমন হয়ে থাকে। প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম সোহাগার দ্রবণ স্প্রে করে রোগ নিরাময় হয়।

ঢলে পড়া রোগ

চিনব কী দিয়ে

ফল, ফুল সহ পূর্ণাঙ্গ সতেজ গাছ হঠাৎ কোনো লক্ষণ ছাড়া ঢলে পড়ে। ক্রমশ গাছ শুকিয়ে মারা যায়। লক্ষণ বোঝার জন্য কাঁচের গ্লাসের মধ্যে পরিষ্কার জল নিয়ে কাণ্ডের কিছুটা অংশ কেটে ডুবিয়ে দিলে কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে জল ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে।

রোগ তাড়াবার উপায়

• প্রতি কেজি বীজের জন্য ১০ গ্রাম ফ্লুওরেসেন্স দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। • এক বিঘা জমির জন্য ১০ কেজি জৈব সারের সঙ্গে ৫০০ গ্রাম ফ্লুওরেসেন্স মিশিয়ে ৪-৫ দিন ছায়া জায়গাতে রেখে মূল জমি তৈরির সময় মাটিতে মিশিয়ে মাটি শোধন করতে হবে। • পেঁয়াজ, রসুন, গাজর প্রভৃতি ফসল দিয়ে মিশ্র চাষ করলে রোগের প্রকোপ কম হয়।

সাদা ছোপ পাউডার রোগ

চিনব কী দিয়ে

পাতার উপরে মনে হবে কেউ যেন পাউডার ছড়িয়ে রেখেছে। এই সাদা দাগ ক্রমশ বাদামি রঙের হতে থাকে। পাতা শুকিয়ে যায়।

রোগ তাড়াবার উপায়

• পেঁপে পাতার দ্রবণ • চুন তুঁতের বোর্দ মিশ্রণ পাতায় হলদে দাগ

পাতায় হলদে দাগ

চিনব কী দিয়ে

পাতার উপরে হলদে রঙের গোলাকার ছোপ দাগ পড়ে, ক্রমশ বড়ো হতে থাকে। গাছের বৃদ্ধি কমে যায়, ফল, ফুল ধরার পরিমাণ কমে যায়।

রোগ তাড়াবার উপায়

• প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ১০ গ্রাম ট্রাইকোডারমা ভিরিডি দিয়ে বীজশোধন করতে হবে • প্রতি বিঘা জমিতে ৫০০ গ্রাম ট্রাইকোডারমা ভিরিডি দিয়ে মাটি শোধন করতে হবে

• প্রতি লিটার ১০ গ্রাম ট্রাইকোডারমা ভিরিডি কালচার গুলে ফসলে স্প্রে করতে হবে। অথবা ১ ভাগ গোমূত্রের সঙ্গে ১০ ভাগ জল মিশিয়ে ফসলে স্প্রে করতে হবে।

পাতা ধ্বসা রোগ বা বাদামি দাগ রোগ

চিনব কী দিয়ে

পাতায় প্রথমে হলদে দাগ হয় এবং ক্রমশ তা বাদামি থেকে গাঢ় বাদামি আকার ধারণ করে এবং পাতা পুড়ে যায়।

রোগ তাড়াবার উপায়

• ট্রাইকোডারমা ভিরিডি দিয়ে বীজও মাটি শোধন করতে হবে। • ১ শতাংশ বোর্দ মিশ্রণ প্রয়োগ। • ১ ভাগ গোমূত্রের সঙ্গে ১০ ভাগ জল মিশিয়ে ফসলে স্প্রে করতে হবে • ১০০ গ্রাম আদা বেটে ৫ লিটার জলে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর পরিস্কার কাপড়ে ছেঁকে ফসলে স্প্রে করতে হবে।

ধানের পোকা

মাজরা পোকা

চিনব কী দিয়ে

খরিফ ও রবি মরশুমেই এই পোকার আক্রমণ হয়। ধানের বৃদ্ধির সময় এই পোকার আক্রমণ হলে মাছের পাতা শুকিয়ে হলুদ হয়ে যায়। শীষ আসার সময় এই পোকার আক্রমণ হলে শীষ সাদা হয়ে শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত শীষ বা কাঠি টানলে উঠে আসে।

পোকা জব্দ করার উপায়

• তামাক পাতার দ্রবণ • পাট বীজের দ্রবণ • নিম তেলের দ্রবণ • নিম বীজের দ্রবণ • নিম পাতার দ্রবণ

শ্যামা পোকা

চিনব কী দিয়ে

পাতার নীচে বসে খুব ছোটো ছোটো সবুজ পোকা পাতার শিরা থেকে রস চুষে খায়। পাতার রস চুষে খাবার সময় পোকার বিষাক্ত নালা গাছের পাতা সংক্রমিত করে দেয়, ফলে পাতার কিনারা বরাবর হলুদ রঙ ধারণ করে, পাতা বিবর্ণ হয়ে যায়, পাতার কার্য্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়।

পোকা জব্দ করার উপায়

• তামাক পাতার দ্রবণ • পাট বীজের দ্রবণ • নিম তেলের দ্রবণ • নিম বীজের দ্রবণ • নিম পাতার দ্রবণ

বাদামি শোষক পোকা

চিনব কী দিয়ে

ধানের জীবনদশার শেষের দিকে সাধারণত ফুল আসার পর এই পোকার আক্রমণ বেশি লক্ষ্য করা যায়। এই পোকা বাদামি বর্ণের হয় এবং এক সঙ্গে অনেক পোকা গাছের গোড়ায় বসে রস শুষে খায়। ফলে গাছ শুকিয়ে যায় ও মাঠে চাক চাক ঝলসানো অংশ দেখা যায়।

পোকা জব্দ করার উপায়

• বাদামী শোষক পোকা যেখানে লেগেছে তার চারিদিকের ধান গাছ ফাঁকা করে দিতে হবে যাতে আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে • প্রতি কেজি সাদা বালির সাথে ৫০ গ্রাম লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে গণ্ডি করে দিতে হবে।

পামরি পোকা

চিনব কী দিয়ে

পূর্ণাঙ্গ পোকা এবং তাদের হাল্কা রঙের কীড়া উভয়েই পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ক্ষতি করে। আক্রমণের ফলে পাতার সাদা সাদা দাগ দেখা যায়।

পোকা জব্দ করার উপায়

• নিম পাতার দ্রবণ নিম বীজ বা তেলের দ্রবণ • তামাক পাতার দ্রবণ

পাতা মোড়া পোকা

চিনব কী দিয়ে

ফিকে সবুজ রঙের কীড়া ধান গাছের পাতা লম্বালম্বিভাবে মুড়ে নলের মতো করে এবং মোড়ানো অংশের ভিতরে থেকে সবুজাংশ খেয়ে সাদা করে ফেলে। গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

পোকা জব্দ করার উপায়

নিমের যে কোনো দ্রবণ ব্যবহার করা যায়।

লেদা পোকা

চিনব কী দিয়ে

লেদা পোকা সাধারণত প্রচুর বৃষ্টির পর বিপুল সংখ্যায় দলবদ্ধভাবে মাঠের পর মাঠ আক্রমণ করে ধান মুড়িয়ে খেয়ে নেয় এবং বিস্তীর্ণ এলাকায় বিপুল ক্ষতি করে।

পোকা জব্দ করার উপায়

• আঠা, তিতো ও গন্ধ পাতার দ্রবণ • নিম তেলের দ্রবণ • তামাকপাতার দ্রবণ

শীষ কাটা লেদা পোকা

চিনব কী দিয়ে

শীষকাটা লেদা পোকার কীড়া প্রথমাবস্থায় পাতা খায় পরবর্তীকালে ধানের শীষ কেটে বিপুল ক্ষতি করে। এদের কীড়া দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে রাত্রে ক্ষতি করে। গাছের গোড়ায় এদের মল দেখে এদের উপস্থিতি বোঝা যায়।

গন্ধি পোকা

চিনব কী দিয়ে

পূর্ণাঙ্গ কীট এবং তাদের অপূর্ণাঙ্গ অবস্থা ধানে কচি শিষে লম্বা হুল ফুটিয়ে ধানের দুধ শুষে খায়। ফলে শিষের ক্ষতিগ্রস্ত ধান চিটে হয়ে যায় এবং ক্ষতস্থানের চারপাশে বাদামি রঙের দাগ পড়ে। ধানের ক্ষেতে গেলে গন্ধি পোকার দুর্গন্ধ থেকে তাদের উপস্থিতি বোঝা যায়।

পোকা জব্দ করার উপায়

• আঠা, তিতো ও গন্ধ পাতার দ্রবণ • নিম তেলের দ্রবণ • তামাক পাতার দ্রবণ

পোকারা কিন্তু সবাই শত্রু নয়। মানুষের মতো ওদের মধ্যেও বন্ধু আর শত্রু দুইই আছে। ওপরে আমরা শত্রুদের কথা বলেছি। এবার জেনে নেওয়া যাক কিছু বন্ধু পোকার কথা।

বন্ধু পোকা

লেডিবিটল
দৈনিক ৫-১০টি শত্রু পোকার ডিম বা বাচ্চা ও ধীরে চলে এমন ছোটো পোকা এরা খায়। বাচ্চারা বেশি খায়।

প্রাপ্ত বয়স্ক গ্রাউন্ড বিটল
পূর্ণ বয়স্ক ও বাচ্চা উভয়ই দৈনিক ৩-৫টা শিকার ধরে। ধানের ভেপুর পোকা খেতে এরা বেশি পছন্দ করে। পূর্ণ বয়স্করা ধানের বাদামি ও অন্যান্য শোষক পোকাও খায়।

উরচুঙ্গা
বিভিন্ন পোকার ডিম খেতে এরা পছন্দ করে। বিভিন্ন পোকার কীড়া, ছোটো ছোটো গাছ ও পাতা ফড়িং বা শোষক পোকা, মাজরা পোকা, ভেপু পোকা, চুঙ্গি পোকার বাচ্চা শিকার করে খায়।

ঘাস ফড়িং
এরা রাতে বেশি তৎপর থাকে। পাতা যেমন খায় তেমনি মাজরা পোকা, গন্ধি পোকা, সাদা ও বাদামি শোষক পোকার বাচ্চা ও ডিম খায়। দেখা গেছে দিনে ৩-৪টি মাজরা পোকার ডিমের গাদা খেয়ে শেষ করতে পারে।

ওয়াটার বাগ
গাছ ফড়িং বা শোষক পোকার বাচ্চা ও অন্যান্য নরম দেহী পোকা দিনে ৪-৭টা পর্যন্ত শিকার করে। এটা ছাড়াও ছোটো বড়ো আরও বিভিন্ন প্রজাতির ওয়াটার বাগ ধানের ক্ষেতে দেখতে পাওয়া যায়।

মিরিড প্ল্যান্ট বাগের বাচ্চা ও পূর্ণ বয়স্ক
পূর্ণ বয়স্করা পাতা ও গাছ ফড়িং বা বিভিন্ন শোষক পোকা ৭-১০টা ডিম বা ১-৫টা বাচ্চা ধরে শুষে খায়।

পূর্ণ বয়স্ক পলিটোক্সাস প্ল্যান্ট বাগ
গন্ধি পোকার মতো দেখতে তবে ধূসর রঙের। সাধারণত একাকী ঘুরে বেড়ায়। বিভিন্ন প্রজাতির মথ ও প্রজাতির কীড়া শুষে খায়। নিজের আকারের চেয়ে বড় আকারের পোকা শিকার করতে পারে।

ড্যামজেল ফ্লাই

পূর্ণ বয়স্ক পোকা ধান গাছের পাতার নীচে নীচে উড়ে বেড়ায় ও বিভিন্ন পোকা এবং পাতা ও গাছ ফড়িং-এর বাচ্চা শিকার করে।

পূর্ণাঙ্গ ইয়ার উইগ

রাতের বেলায় এরা বেশি তৎপর থাকে। মাজরা পোকা, ভেপু পোকার কীড়া খায়। দৈনিক ২০-৩০ বিভিন্ন শিকার ধরে।

মাকড়সা

নেকড়ে মাকড়সা দৈনিক ৫-১৫টি মাজরা পোকার মথ বা বিভিন্ন ধরনের শোষক পোকা শিকার করে।

লম্বামুখী মাকড়সা

বিভিন্ন মথ, পাতা ফড়িং বা শোষক পোকা বিভিন্ন ধরনের মাছি ইত্যাদি শিকার করে।

ধানের রোগ

রোগ

ঝলসা রোগ

চিনব কী দিয়ে

বীজতলা থেকে শীষ আসা পর্যন্ত ধানে এই রোগের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। খরিফ ও রবি মরশুমের ধানে এই রোগ দেখা যায়। মেঘলা কুয়াশাচ্ছন্ন আর্দ্র আবহাওয়া অত্যাধিক নাইট্রোজেন সারের প্রয়োগ ও রোগসহনশীল জাতের চাষ না করলে এই রোগের আক্রমণ ও বিস্তার ব্যাপক হয়। এই রোগে ধানের পাতায় চোখ মাকুর মতো দাগ দেখা যায় যার মাঝখানটা ধূসর রঙের এবং বাইরের দিকটা গাঢ় বাদামি রঙের। অনেকগুলি দাগ একসঙ্গে মিশে গিয়ে বড়ো দাগে পরিণত হয় এবং ধানগাছের পাতা লালচে বাদামি বর্ণ ধারণ করে শুকিয়ে যায়। ফুল আসার সময় আক্রমণ হলে শীষের নীচের গাঁটে বাদামি ছোপ দেখা যায় পরবর্তীকালে জায়গাটি পচে যায় এবং আক্রান্ত শীষটি ওই স্থানে ভেঙে যায়, ফলে ধান চিটে হয়ে যায়।

রোগ তাড়াবার উপায়

এই রোগ একবার লাগলে সারানো কঠিন হয়ে পরে। তাই ঝলসা লাগা গাছের বীজ থেকে বীজ রাখা যাবে না।

নিয়ন্ত্রণ

• ১ কেজি গোবর ১০ লিটার জলে গুলে রেখে ২৪ ঘণ্টা পরে ছেঁকে নিয়ে গোবর জল স্প্রে করতে হবে। • গোবর জল স্প্রে করার ৭ দিন পরে নিম তেল স্প্রে করতে হবে। এইভাবে প্রতিটি দ্রবণ ৭ দিন অন্তর ২ বার করে ব্যবহার করতে হবে।

খোলা ধ্বসা

চিনব কী দিয়ে

পাশকাটি ছাড়ার সময় এই রোগ আবির্ভূত হলেও শীষ আসার সময় এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি লক্ষ্য করা যায়। পাতার যে যে অংশ ডাঁটার চারিদিকে জড়িয়ে থাকে তার উপর ঠিক জলস্তরের উপরে প্রথমে মেটে সবুজ রঙের ছোপ ছোপ দাগ দেখা যায়, পরে ওই দাগ একটার সঙ্গে আর একটা মিশে হাল্কা বাদামি রঙের হয় ও পচে যায়। একই ধরনের লক্ষণ অনেক সময় পাতাতেও লক্ষ্য করা যায়। আক্রমণ বেশি হলে পাশকাটি মরে যায় এবং ফলন খুব কমে যায়।

রোগ তাড়াবার উপায়

• ১ কেজি গোবর ১০ লিটার জলে ভালো করে গুলে ২৪ ঘণ্টা রেখে দিতে হবে। ছেঁকে নিয়ে জল স্প্রে করতে হবে।

খোলা পচা

চিনব কী দিয়ে

ধানে থোড় আসার সময় এই রোগের আক্রমণ দেখা যায়। শেষ পাতার খোলের উপরে ধূসর রঙের বিভিন্ন আকৃতির দাগ দেখা যায়, যার চার দিকটা বাদামি রঙের। রোগের আক্রমণ বেশি হলে অনেক সময় শীষ আংশিক বার হয় বা মোটেই বার হতে পারে না এবং ধান কালো ও চিটে হয়ে যায়।

জৈব নিবিড় রোগপোকা নিয়ন্ত্রণ

• রোগ তাড়াবার উপায় • গোবর জলের দ্রবণ স্প্রে

বাদামী দাগ রোগ

চিনব কী দিয়ে

এই রোগে ধানের পাতায় অনেক সময় ধানে তিলের মতো বাদামি বা ছাই রঙের দাগ দেখা যায়। রোগের আক্রমণ বেশি হলে ধান চিটে হয়ে যায় এবং রোগাক্রান্ত ধানের ভাত তেতো লাগে।

রোগ তাড়াবার উপায়

• রোগ সহনশীল জাতের চাষ • বীজ শোধন করতে হবে • নিম তেলের দ্রবণ স্প্রে করতে হবে।

লক্ষ্মীর বুটি

চিনব কী দিয়ে

কিছু কিছু ধানের জাতে এই রোগ মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায়। আক্রান্ত গাছে শীষ বেরোনোর পর দুধ অবস্থায় কালচে সবুজ রঙের নরম বুটি দেখা যায়।

রোগ তাড়াবার উপায়

• ৫২° তাপমাত্রায় ১০ মিনিট ধান বীজ শোধন করে নিতে হবে।
• পরিচ্ছন্ন চাষ করতে হবে।

গোড়াপচা

চিনব কী দিয়ে

নীচু, জল নিকাশী সুবিধাহীন জমি ও পচা মাটিতে এই রোগ দেখা যায়। এই রোগে গাছের গোড়া ও শিকড় পচে কালো হয়ে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি ও ফলন ব্যাহত হয়।

রোগ তাড়াবার উপায়

• সহনশীল জাতের চাষ করতে হবে • জমি পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। • গোবর জল স্প্রে করতে হবে।

ব্যাকটিরিয়াজনিত রোগ

চিনব কী দিয়ে

এই রোগের আক্রমণে ধান গাছের পাতা ডগার দিক থেকে কমলা রঙের হতে শুরু করে কিনারা বরাবর নীচের দিকে নামে এবং শেষ পর্যন্ত পাতাটি শুকিয়ে খড় হয়ে যায়। কাঁচা থোড় আসার আগে থেকে ধানে দুধ হওয়া পর্যন্ত এই রোগের আক্রমণ বেশি দেখা যায়। চারা অবস্থা থেকে রোয়ার পর পর্যন্তও এই রোগের দ্বারা ধান গাছ আক্রান্ত হতে পারে।

রোগ তাড়াবার উপায়

• সহনশীল জাতের চাষ করতে হবে। • জমি পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। • গোবর জল স্প্রে করতে হবে।

ডালজাতীয় শস্যের পোকা

শুঁটি ছিদ্রকারী পোকা

পূর্ণাঙ্গ পোকা মাঝারি আকৃতির হালকা বাদামী রঙের। ডানার পিছনের দিকে ইংরাজী 'V' আকৃতির দাগ দেখা যায়। ডানার ভিতরের দিকে 'কিডনি' আকৃতির দাগ দেখা যায়। লার্ভা কচিপাতা খেতে পছন্দ করে। পরে লার্ভা শুঁটি ছিদ্র করে গাছের মারাত্মক ক্ষতি করে। একটি লার্ভা ৩০-৪০টি পর্যন্ত শুঁটি নষ্ট করতে পারে। সাধারণত এই পোকা অড়হর,মুগ, মটর, ছোলা ইত্যাদি ডালশস্যে দেখা যায়।

হেয়ারি ক্যাটারপিলার/রোমশ শুঁটিপোকা

এই পোকার লার্ভা দশা দাতায় সবুজ অংশকে খেয়ে ফেলে। সাধারণত স্ত্রী পোকা পাতার নীচে একসঙ্গে ৪০০-১২০০ টি পর্যন্ত ডিম পাড়তে পারে যা ৮-১০ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে লার্ভা বেরিয়ে আসে। এই পোকার আক্রমণে ডালজাতীয় শস্যের বিশেষ করে সিম, বিউলি ইত্যাদি ফসলের পাতা সাদা রঙে পরিণত হয়।

সবুজ শুঁয়োপোকা

এই পোকা ডালজাতীয় ফসল ছানাও তুলো, ঢেঁড়শ প্রভৃতি ফসলেও দেখা যায়। পূর্ণাঙ্গ পোকার মথ হলদেটে থেকে হালকা কমলা রঙের যা ৮-১২দিন বেঁচে থাকে এবং জীবদশায় ৫৭৭টি পর্যন্ত ডিম পাড়ে। পাতার উপরে অসংখ্য ছিদ্র করে পাতা খাওয়া দেখলে এই পোকা লেগেছে বলে বোঝা যায়।

পাতা মোড়া পোকা

এই পোকা অড়হরের সঙ্গে সঙ্গে মুগ, বিউলি, বরবটি, ছোলা, মুসুর, সিম, মটর ইত্যাদি ফসলে দেখা যায়। পূর্ণাঙ্গ পোকা ধূসর রঙের পিছনের ডানায় চারটি কালো রঙের দাগ দেখা যায়। এই পোকার শুঁয়ো পাতা মুড়ে দেয়। এছাড়া কুঁড়ি, ফুল, শুঁটিতে প্রবেশ করে ও রস খেয়ে ফেলে।

নীল প্রজাপতি

পূর্ণাঙ্গ পোকা মাঝারি আকৃতির ও বেগুনি রঙের। ডানার শেষ অংশে কালো ও সাদা রঙের দাগ দেখা যায়। লার্ভা কুঁড়ি, ফুল এবং সবুজ শুঁটিকে আক্রমণ করে। শুঁটি পরিপক্ক হলে তবেই পোকার সৃষ্টি ছিদ্রগুলি দেখা যায়।

লাল শুঁয়োপোকা

মুগ ও কলাইয়ের অন্যতম প্রধান কীটশত্রু হল লাল শুঁয়োপোকা। এই শুঁয়োপোকা পাট গাছেও দেখা যায়। পাটগাছ কাটার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ফসলে ছড়িয়ে পড়ে। একে অন্যকে পাটের বিছা পোকাও বলে।

কাণ্ড ছিদ্রকারী মাছি

মটরশুঁটি এবং বরবটির একটি প্রধান শত্রু হল কাণ্ড ছিদ্রকারী মাছি। এটি সয়াবিনেও দেখা যায়। মাছির কীড়া বা ম্যাগট পাতায় ছিদ্র করে বোঁটার ভিতর দিয়ে ডাঁটার দিকে যায় এর ফলে গাছ ঢলে পড়ে শুকিয়ে যায়। গাছের চারা এই অবস্থায় ক্ষতি হয়ে যায়।

জাবপোকা

পূর্ণাঙ্গ এবং অপূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এরা একসঙ্গে দলবদ্ধভাবে বাস করে এবং গাছের বৃদ্ধি শীল কচি ডগা, ফুল ও ফুলের বোঁটা এবং কচি শুঁটির রস চুষে যায়। আক্রান্ত পাতা হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এক্ষেত্রে আক্রান্ত শুঁটিতে বীজ সৃষ্টি হয় না ।

কাটুই পোকা

কাটুই পোকা রাতে চারা ছোলা গাছের গোড়ায় কাণ্ড কেটে দেয়।

ডালজাতীয় শস্যের রোগ

মরচে রোগ

প্রথমে পাতা, পরে অন্যান্য সবুজ অংশে খুদে খুদে গোল বা উপবৃত্তাকার, হালকা বাদামী বা কালচে বাদামী রঙের সামান্য উঁচু উঁচু ফুসকুড়ির মত দাগ দেখা যায়। ফুসকুড়ি গুলি ক্রমশ জুড়ে যায় এবং পাতা মরচে পড়ার মতো হয়ে যায়। রোগ বেশি হলে গাছের পাতা ঝরে যায়, গাছ শুকিয়ে মারা যায়। এই রোগটি ছোলা, মটর, মুগ, মাসকলাই প্রভৃতিতে দেখা যায়।

ঝলসালো বা ধ্বসা রোগ

গাছের সমস্ত সবুজ অংশেই লক্ষণ দেখা যায়। ডাঁটা বা পাতার প্রথমে গোলাকার জলে ভেজা ছোপ দেখা যায় পরে তা হলদেটে ধূসর হয়, ফলে ডাল শুকিয়ে বা ঝলসে যায়। এই অবস্থাকে বলা হয় ঝলসানো। বেড়ে ওঠা বীজেও এই দাগ দেখা যায়। ফুল আসার সময়ই গাছ সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। এই রোগটি ছোলা, মটরে দেখা যায়।

ঢলে পড়া

এই রোগের প্রধান লক্ষণ হল পাতা আর বোঁটায় হঠাৎ ঝিমিয়ে পড়া। কখনও কখনও পরিণত গাছের আক্রমণের ফলে গাছের পাতাগুলি প্রথমে নেতিয়ে পড়ে। স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়ে যায় বা ফ্যাকাশে হলদে রঙ নেয় এবং পড়ে যায়। অড়হরের ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত গাছের গোড়ায় সাদা বা ছত্রাকের গোলাপী রঙের পেপারসহ কলোনী দেখা যায়। এই রোগটি ছোলা, অড়হর, মটরে দেখা যায়।

ঝাঁকড়া মাথা বা নিস্ফলা মোজাইক

আক্রান্ত অড়হর গাছের ডালের মাথায় পাতাগুলি জড়ো হয়ে বেরোয়। খানিকটা ফ্যাকাশে, ছোট ছোট একটু বিকৃত হয়ে কুঁচকে যেতে দেখা যায়। সব মিলিয়ে ডালের মাথায় একটা গুচ্ছ দেখা যায়। পর্বমধ্যগুলি ছোট হয়ে যাওয়ায় গাছটি বেঁটে হয়ে যায়। পাতায় হালকা হলুদ বা ফিকে সবুজ ছোপ ধরে এবং পতাংশ গোল হয়ে যায়। আক্রান্ত গাছগুলি ফুল ফলহীন বা নিস্ফলা হয়ে যায়। এটি একটি ভাইরাসঘটিত রোগ। এর প্রধান বাহক মাকড়। এই রোগের প্রার্দুভাব অড়হরে বেশি লক্ষ্য করা গেছে।

সাদা গুঁড়ো ছাতা

শুকনো অঞ্চলে বা অপেক্ষাকৃত শুকনো বছরে এই রোগের উপদ্রব খুব বেশি দেখা যায়। রোগের লক্ষণ প্রথম পাতাতে দেখা গেলেও সমস্ত সবুজ আলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পাতার দু'পিঠে নানান মাপের ছোট ছোট, গোল পাতলা ছত্রাক সূতোর জাল সৃষ্টি হয়। প্রথমে বিবর্ণ খুদে ছোপ মত থাকে। দু-একদিন পরে ময়দা গুঁড়ো ছড়ানো স্পষ্ট দাগ হয়। গুঁড়ো গুলি হল ছত্রাকের কনিডিয়া। এই ছত্রাক ধান, মুগ, মাসকলাই, বাঁধাকপি, মুসুর, মটর প্রভৃতিকে আক্রমণ করে।

মটরের ভিজে ছাতা (তুলো) রোগ

গাছের পাতার তলার দিকে ভিতে তুলোর মতো ছত্রাক বেড়ে ওঠে। বরাবর উপর পিঠে প্রথমে হলদে ও পরে বাদামী হয়ে পাতা শুকিয়ে যায় এবং পাতা খসে পড়ে। শুঁটির দাগ হয় লম্বাটে। গাছ বামন হয়ে যায়। এই রোগটি মটর ছাড়া খেসারিতেও দেখা যায়।

হলুদ ছোপ বা মোজাইক

প্রথম কচি পাতায় ছেটানো ছোট ছোট হলদে দাগ হিসেবে দেখা যায়। পরে যে সব পাতা বেরোয় তাতে মাঝারি মাপের হলুদ সবুজ দাগ দেখা যায়। ক্রমান্বয়ে নতুন নতুন পাতায় হলুদের অনুপাত বাড়তে থাকে। শুঁটি মাপের ছোট, কোঁচকালো ও দানাগুলি ছোট ও অপরিণত, বীজেও হলদে ছোপ দেখা যায়। মাস কলাইয়ের ক্ষেত্রে হলুদ ও কালো দু'রকম ছোপ দেখা যায়। রোগটি বিন ইয়োলো মোজাইক ভাইরাস দ্বারা সংগঠিত হয়। ভাইরাসটি সাদা মাছি দ্বারা বাহিত হয়। রোগটি মাসকলাই, মুগ, রাজমা ইত্যাদিতে দেখা যায়।

গোড়া পচা ও পাতা ধ্বসা রোগ

পাট, আলু বা অন্য বহু আনাজের জমিতে এই ছত্রাকের প্রকোপ বেশি থাকে বলে যেসব মাঠে মুগের চাষ করা হলে রোগটির প্রকোপ বেশি দেখা যায়। মাটির কাছাকাছি কাণ্ডে গাঢ় বাদামী দাগ ধরে। দাগটি ছড়িয়ে গিয়ে কাণ্ড ও শিকড় ঘিরে ফেলে। ওই অঞ্চলে ছত্রাকের খুদে খুদে কালো কালো বিন্দুর মত গুটি দেখা যায়। কচি ডালে নরম ডাঁটিতে, পাতায় ছোট ছোট বাদামী দাগ ধরে, যেগুলি পরে জুড়ে যায়। এই রোগ মুগে বেশি দেখা যায়।

কালো গর্ত পচা বা ক্ষত

বীজপত্র, ডাঁটা, শুঁটি বাদামী থেকে কালো নীচু গর্তের মত দাগ হয়। ক্ষত অতি ক্ষুদ্র বড় হয় এবং চারা গাছ মেরে ফেলে। এই রোগ মুগ, মাসকলাই, বরবটি, সিম, ফ্রেঞ্চবিন ইত্যাদিতে দেখা যায়।

পাতা কোঁকড়ানো (ভাইরাসজনিত)

কচি পাতার উপর পিঠে অস্পষ্ট কোঁকড়ানো দেখা যায়। আক্রান্ত গাছে বেশি ফুল আসে। ফুলের পাপড়ি হয়ে যায় মোট ও সবুজ। গাছটি ঝাঁকড়া বা গুচ্ছ দেখায়। মাস কলাইতে পাতা বড় হয়েও যায়। পাতার রস বীজ ও বাহক জাবপোকা দ্বারা এই রোগ ছড়ায়। মুগ, মাসকলাই ছাড়া সয়াবিন ও বরবটিতেও এই রোগটি ছড়ায়।

ব্যাক্টেরিয়াজনিত আধা-ঝলসানো

পাতায় জলে ভেজা দাগ হয় প্রথমে। পরে চার ধারে একটা হলদেটে আভা দেখা যায়। আর দাগটা হয়ে যায় বাদামী। ব্যাক্টেরিয়াটি বীজবাহিত। এই রোগ মুগ, কলাইয়ে দেখা যায়।

পাতায় পোড়া দাগ

পাতার দু'পিঠেই উঁচু উঁচু লালচে বাদামী ছোট ছোট দাগ হয়। প্রথমে দাগগুলি খড়খড়ে থাকে। পরে সেগুলি উঠে গিয়েও পাশাপাশি জুড়ে গিয়ে পাতার অনেকটা এলাকা জুড়ে গিয়ে পুড়ে গেছে মনে হয়। জীবাণুটি বীজ দ্বারা বাহিত হয়। সাধারণত মুগ, মাসকলাই, বরবটি, সিম ইত্যাদিতে এই রোগ দেখা যায়।

তৈলজাতীয় ফসলের পোকা

পাতা ও শুঁটির কীড়া

পোকার কীড়া তিল গাছের কচি পাতা খেয়ে নষ্ট করে এবং গাছের ডাঁটা ও শুঁটির মধ্যে ছিদ্র করে ঢুকে পড়ে। পরে ডগার পাতাগুলি একসঙ্গে আলোকিত করে পুত্তলী অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এরা ফুল ও বীজ খেয়েও ক্ষতি করে।

হক মথ

হক মথ কালচে হলুদ বর্ণের, এরা এককভাবে পাতায় ডিম পাড়ে। এপ্রিল মে মাসে এই কীটের সর্বাধিক আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। তিল গাছের খেতে এই পোকার আক্রমণ খুব বেশি হয়। এদের ডিম থেকে নির্গত ম্যাগট ফুল ও কুঁড়িকে আক্রমণ করে।

জাবপোকা

পৌষ মাসের শেষ থেকে জাবপোকার আক্রমণ শুরু হয়। মেঘলা আবহাওয়ায় অথবা কুয়াশার এরা খুব তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি করে। সংখ্যায় খুদে, অলস প্রকৃতির নরম পোকা গাছের সঙ্গে লেপটে থেকে গাছ থেকে রস শুষে খায়। ফুল ফল ধরতে শুরু করার সময় পোকা লাগলে ফুল মরে যাবে। দানা পুষ্ট হবে না।

করাত মাছি

সবুজ রঙের কীড়া গাছের পাতা খেয়ে ফেলে। চারা অবস্থায়ও ঘন করে বীজ বোনা জমিতে এই পোকার আক্রমণ বেশি হয়। এই পোকা সরষে গাছে দেখা যায়। কুসুমের লেদা পোকা লেদা পোকা কুসুম গাছের পাতাগুলি খেয়ে নষ্ট করে। অনেক সময় কচি ফলগুলিও নষ্ট হয়। মথ এককভাবে অথবা ছোট ছোট থোকায় গাছের পাতায় অথবা ডাঁটায় ডিম পাড়ে। ডিম থেকে ৪ দিন পর কীড়া বেরিয়ে আসে ও পাতা খেতে শুরু করে।

কুসুমের লেদা পোকা

লেদা পোকা কুসুম গাছের পাতাগুলি খেয়ে নষ্ট করে। অনেক সময় কচি ফলগুলিও নষ্ট হয়। মথ এককভাবে অথবা ছোট ছোট থোকায় গাছের পাতায় অথবা ডাঁটায় ডিম পাড়ে। ডিম থেকে ৪ দিন পর কীড়া বেরিয়ে আসে ও পাতা খেতে শুরু করে।

পাতামোড়া পোকা/পাতা জড়ানো পোকা

মথের সবুজ রঙের কীড়া রেশমি তন্তুর জাল দিয়ে পাতা জড়িয়ে ফেলে এবং সেই জট পাকানো দলের ভিতর থেকে পাতা খায় ও মালা করে। এর ফলে সরিষার ফুলেরও শুঁটির বিকাশ ব্যাহত হয়।

উইপোকা

বাদামের খেতে উইপোকা মারাত্মক ক্ষতি করে। সাধারণত পূর্ণাঙ্গ বাদাম গাছের গোড়া ও বাদামে এরা আক্রমণ করে ও ফসল নষ্ট করে।

তেলজাতীয় ফসলের রোগ

ধ্বসা রোগ

এই রোগের লক্ষণ শিকড় ছাড়া সব অঙ্গেই দেখা যায়। পাতা, ডাঁটা, মঞ্জরী ও শুঁটিতে বাদামী রঙের ছোপ দেখা যায়। আক্রান্ত গাছ বাড়তে পারেনা, বেঁটে থেকে যায় ও পরে মারা যায়। আক্রান্ত গাছের শুঁটিগুলি কোঁকড়ানো বীজযুক্ত হয়। প্রায় সব রকমে তেল জাতীয় ফসলেই ধ্বসা রোগ দেখা যায়।

শিকড় ফোলা

ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট এই রোগে গাছের শিকড়ে সাদাটে ও পরে ধূসর কালো দাগ দেখা যায়। আক্রান্ত গাছ বেঁটে ও ফ্যাকাসে হয়। এইভাবে শিকড়টি হলে মাটিতে ছত্রাকের স্পোর ছড়িয়ে পড়ে ও অন্যান্য গাছের শিকড় ফোলা রোগ হয়।

গোড়া ও শুঁটি পচা

রোগটি রাইজকটনিয়া, সোনালি নামক ছত্রাক দ্বারা হয়ে থাকে। ঘনভাবে লাগানো জমিতে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া সৃষ্ট রোগটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত অংশগুলি কালচে বাদামী হয়ে যায়।

ফাইলোডি

রোগের লক্ষণ প্রধানত ফসলে ফুল আসার সময় প্রকাশিত হয়। ফুলের বিভিন্ন অংশগুলি সবুজ পাতার মত হয়। ফুলে বৃত্তি, দলমণ্ডল ইত্যাদি বড় হয়ে পাতার মতো হয়ে যায়। আক্রান্ত গাছের ফুলের কাছাকাছি পাতাগুলি ছোট ও হলুদ হয়ে যায়। রোগটি ব্যাক্টেরিয়া জনিত। এই রোগ তিল, সরষেতে বেশি দেখা যায়।

পাতায় সাদা ছাতা/তুলো রোগ

রোগটি প্রধানত সরষের চারা গাছের বেশি দেখা যায়। পাতার তলার পিঠে ছোট বা বড় বেগুনি বাদামী দাগ ধরে। পাতার ওই জায়গার উপর পিঠে হলদে রঙ হয়। নীচের পিঠে দাগের উপর ধূসর রঙের তুলোর মতো শুঁয়ো ছত্রাক সহ তৈরি হয়। এই রোগ ফুলের বৃত্তি, দলমণ্ডল, পুংকেশর সবই কুঁচকে যায়।

মরচে রোগ

পাতার দু'পিঠেই কমলা লাল ফোস্কা দেখা যায়। আকৃতিতে গোল ও ছোট দাগগুলি। নীচের পিঠেই দাগগুলি বেশি দেখা যায়। সাধারণত পাতায় অতিরিক্ত মরচে দেখা গেলে গাছটি মারা যায়। এই রোগটি প্রায় সমস্ত তেলজাতীয় ফসলেই দেখা যায়।

বাদামের টিক্কা রোগ

এই রোগের আক্রমণে পাতায় গোল বা অনির্দিষ্ট লালচে বাদামী বা গাঢ় কালচে লাল দাগ দেখা যায়। উপর পিঠে দাগের চারপাশে একটা সরু হলুদ আভা দেখা যায়। পুরোনো দাগগুলির উপর কালো গুঁড়ো গুঁড়ো কনিডিয়া দেখা যায়। অত্যাধিক দাগ হলে পাতা ঝরে পড়ে বা টাকার মতো কালো ও গোল দাগ দেখা যায়।

সরষে ইত্যাদি ফসলের সাদা দাগ রোগ

সরষে ও আরও কিছু ক্রুসিকেরি পরিবারের ফসল ও রোগটি দেখা যায়। যার মধ্যে মূলো, বাঁধাকপি, ফুলকপি ছাড়াও এই পরিবারভুক্ত কিছু আগাছাতেও এই রোগ দেখা যায়। সাধারণত ফুল বা তার অংশগুলি আক্রান্ত হলে ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। এটি একটি ছত্রাক ঘটিত রোগ। গাছের শিকড় ছাড়া অন্যান্য অংশ ঘিরে রঙের গোল গোল ছোট দাগ দেখা যায়। পাতায় দাগগুলি নীচের পিঠে হয়।

জৈব নিবিড় রোগপোকা নিয়ন্ত্রণ

জৈব নিবিড় রোগপোকা নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপাদানগুলি হল
১। খামার পরিদর্শন
২। রোগপোকা সনাক্তকরণ
৩। তথ্য বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ
৪। উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ
৫। তথ্যায়ন ও মূল্যায়ন

১। খামার পরিদর্শন

নিয়মিত জমি তদারকি ও পরিদর্শন করতে হবে, পোকা ধরে দেখতে হবে, রোগের লক্ষণগুলি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

পরিদর্শনের সময় যে যে বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে সেগুলি হল -

- শত্রু ও বন্ধুপোকার সংখ্যা বাড়ছে না কমছে
- ক্ষতির মাত্রা বাড়ছে না কমছে
- কী কী কারণে রোগপোকার উপদ্রব বাড়ছে
- কোন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ভালো কাজ করছে

২। রোগপোকার সনাক্তকরণ

রোগপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো কিছু সুপারিশ করার আগে সঠিকভাবে সমস্যা ও রোগপোকা সনাক্ত করতে হবে।

৩। তথ্য বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

তদারকি ও পরিদর্শনের ফলে যে তথ্য পাওয়া যাবে তার ভিত্তিতে সঠিক ও কার্যকরী সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, কী ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ

নিয়ন্ত্রণের ধরন পদ্ধতি

পরিচর্যাগত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

• রোগপোকা সহনশীল জাত নির্বাচন। • বীজ শোধন করা • নির্দিষ্ট দূরত্বে বীজ বা চারা লাগানো
• মাটিতে সুসংহত উপায়ে জৈবসার প্রয়োগ করা। • সঠিক ফসলচক্র ও মিশ্রচাষ অনুসরণ করা।
• প্রয়োজনমতো জলসেচ দেওয়া ও নিকাশী ব্যবস্থা রাখা। • আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা

যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

• আক্রমণের শুরুতে হাত দিতে পোকা ও ডিম এবং রোগাক্রান্ত পাতা তুলে ফেলা ও বিনষ্ট করা
• আলোকফাঁদ। • লাঠি বা ডাল পুঁতে পাখি বসার জায়গা তৈরি করে দেওয়া। • শোষক পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচাতে চারাগাছ মশারি দিয়ে ঢেকে রাখা। • হরমোন বা খাবার বিষ ফাঁদ ব্যবহার করা।
• কেরোসিন ভেজানো দড়ি সকালে ধান গাছের উপর দিয়ে টানা।

জৈবিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

• ক্ষেতে যাতে বন্ধু পোকার সংখ্যা বাড়ে তার পরিবেশ তৈরি করা • পরভোজী ও পরজীবি বন্ধুপোকা কৃত্রিমভাবে গবেষণাগারে প্রস্তুত করে ফসলের জমিতে ছাড়া। যেমন লেদা ও মাজরা পোকার জন্য ট্রাইকোগ্রাম জ্যাপোনিকাম নামক বন্ধু পোকা। • গবেষণাগারে বন্ধু জীবাণুর কালচার করে তা জমিতে প্রয়োগ করা যেমন ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েননসিস নামক ব্যাক্টেরিয়াটি ফল ও ডগা ছিদ্রকারী পোকা, লেদা, পাতা খাওয়া পোকা দমন করে, নিউক্লিয়ার পলি হেড্রোসিস ভাইরাস প্রজাপতি জাতীয় পোকার লেদা দমন করতে পারে। • পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য হরমোন ফাঁদ ব্যবহার করা • ক্ষেতে পাখি বসার জায়গা করে দিলে পাখিরা নানা রকমের পোকা ও তার কীড়া, ইঁদুর প্রভৃতি দমন করে।

গাছ গাছড়া ও অন্যান্য দ্রবণ ব্যবহার -

নিমপাতার দ্রবণ

উপকরণ : নিমপাতা ১.৫ কেজি, জল ২.৫ লিটার, সাবান ৫০ গ্রাম, একটি পাত্র

পদ্ধতি: প্রথমে নিমপাতা ভালো করে থেঁতো করে সেটা ২.৫ লিটার জলে মিশিয়ে ৩ দিন রেখে দিতে হবে। ৩ দিন পরে পাতা ও জল ভালো করে নাড়িয়ে ছেঁকে নিতে হবে। এই ফাঁকা জলের সঙ্গে ৫০ গ্রাম সাবান ভালো করে মিশিয়ে আরও ২০ লিটার জলের সঙ্গে মিশিয়ে বিকালে ফসলে স্প্রে করতে হবে।

নিমবীজের দ্রবণ

উপকরণ : নিমবীজের গুঁড়ো - ৫০০ গ্রাম

সাবান - ২০ গ্রাম

জল - ১০ লিটার

পদ্ধতি : ১০ লিটার জলে ৫০০ গ্রাম নিম বীজের গুঁড়ো ১০-১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর সাবান জলে মিশিয়ে একটি লাঠি দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নাড়াতে হবে। দেখা যাবে জলের রঙ ক্রমশ সাদাটে হয়ে যাচ্ছে। এরপর ওই দ্রবণ গাছে স্প্রে করতে হবে।

গোমূত্র দ্রবণ

উপকরণ : গোমূত্র - ১ লিটার, জল ১০ লিটার

পদ্ধতি : ১ ভাগ, গোমূত্রের সঙ্গে ১০ ভাগ জল মিশিয়ে বিকালে গাছে স্প্রে করতে হবে।

গোবরের দ্রবণ

উপকরণ : গোবর - ১ কেজি, জল ১০ লিটার

পদ্ধতি : ১০ লিটার জলে ১কেজি গোবর ভালো করে মিশিয়ে সারারাত ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর একটি কাপড়ে জল ছেঁকে নিয়ে বিকালে স্প্রে করতে হবে।

তিতো, আঠা ও গন্ধযুক্ত পাতার দ্রবণ :

উপকরণ :

তিতো পাতা (যেমন নিম, কালমেঘ প্রভৃতি)	- ৩৫০ গ্রাম
দুধের মতো আঠা বের হয় এমন পাতা	- ৩৫০ গ্রাম
তীব্র গন্ধ আছে এমন আগাছার পাতা	- ৩৫০ গ্রাম
জল	- ১০ লিটার

পদ্ধতি : সমস্ত পাতা ভালো করে থেঁতো করে ৫ লিটার জলে ৩ দিন ভিজিয়ে রাখতে হবে এবং প্রতিদিন ২ বার একটি কাঠি দিয়ে নাড়িয়ে দিতে হবে। ৩ দিন পর জল ছেঁকে নিয়ে তার সঙ্গে আরো ৫ লিটার জল এবং ২৫ গ্রাম সাবান মিশিয়ে গাছে বিকালে স্প্রে করতে হবে।

আদা, রসুন ও লঙ্কার দ্রবণ

উপকরণ : রসুন- ১০০ গ্রাম, আদা- ৫০ গ্রাম, কাঁচালঙ্কা- ৫০ গ্রাম, জল- ১০ লিটার, সাবান- ৩০ গ্রাম।

পদ্ধতি : প্রথমে রসুন ভালো করে থেঁতো করে একটি পাত্রে রেখে ১০ মিলি কেরোসিন তেল মিশিয়ে ভালো করে ঢাকনা দিয়ে ১ রাত রেখে দিতে হবে। এরপর রসুন, আদা এবং লঙ্কা একসঙ্গে মিশিয়ে ৫০ মিলি জলে মিশিয়ে ভালো করে বেটে নিতে হবে। একটি পরিষ্কার কাপড়ে সমস্ত উপাদান রেখে চাপ দিয়ে রস বের করে নিতে হবে। এরপর ৫০০ মিলি জলের সঙ্গে সাবান ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। ওই জলে আদা, রসুনের তেল ঢেলে ভালো করে নাড়িয়ে মিশিয়ে নিতে হবে। সাবান মেশানো দ্রবণের সঙ্গে আরও ৯ লিটার জল মিশিয়ে ফসলে স্প্রে করতে হবে।

নিম, তুঁতে, সোহাগার দ্রবণ

উপকরণ : নিমপাতা- ৫০০ গ্রাম, নিমছাল- ২৫০ গ্রাম, তুঁতে- ১০ গ্রাম, সোহাগা- ৫ গ্রাম, সাবান- ৫০ গ্রাম

পদ্ধতি : একটি পাত্রে ৫ লিটার জল নিয়ে সমস্ত উপাদান মিশিয়ে ৩০-৪৫ মিনিট অল্প আঁচে ফোটাতে হবে। দ্রবণ ঠান্ডা হলে ছেঁকে নিয়ে তার সঙ্গে আরও ১৭ লিটার জল মিশিয়ে বিকেলে স্প্রে করতে হবে।

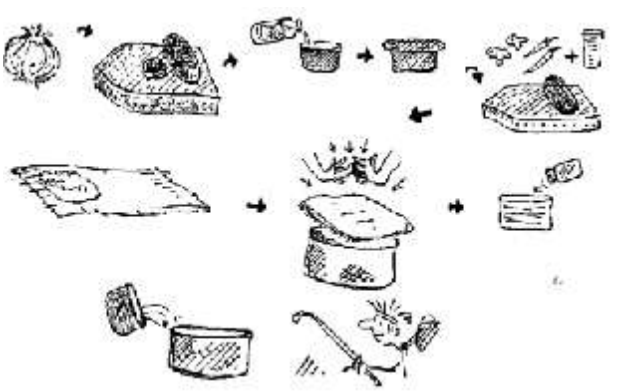

আতা বীজের নির্যাস

উপকরণ : আতা বীজ- ১০০ গ্রাম, সাবান - ২০ গ্রাম

পদ্ধতি : আতা বীজ গুঁড়ো করে নিয়ে ২

লিটার জলের সঙ্গে মিশিয়ে ৪৫ মিনিট অল্প আঁচে ফোটাতে হবে। ফোটানো জল ঠান্ডা হলে ছেঁকে ওই দ্রবণের সঙ্গে ২০ গ্রাম সাবান এবং আরও ১০ লিটার জল মিশিয়ে ফসলে স্প্রে করতে হবে।

তামাক পাতার দ্রবণ

উপকরণ : তামাক পাতা - ৫০-১০০ গ্রাম, সাবান - ২০ গ্রাম, জল - ১০ লিটার

পদ্ধতি : তামাক পাতা কুঁচি কুঁচি করে কেটে ২ লিটার জলে সারা রাত ভিজিয়ে রেখে দিতে হবে। এরপর তামাক পাতা ভালো করে নিংড়ে পাতার নির্যাস বের করে নিতে হবে। ওই তামাক পাতার নির্যাসের সঙ্গে আরও ৮ লিটার জল এবং ২০ গ্রাম সাবান ভালো করে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে হবে।

তুলসী পাতা ও দুধের দ্রবণ

উপকরণ : দুধ - ৫০০ মিলি লিটার, তুলসী পাতা - ৫০ গ্রাম, সাবান - ৩০ গ্রাম

পদ্ধতি : প্রথমে তুলসী পাতা ভালো করে থেঁতো করে ১ লিটার জলে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর তুলসী পাতার রস ভালো করে নিংড়ে নিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। তারপর ওই জলের সঙ্গে আরও ৯ লিটার জল, ৫০০ মিলি দুধ এবং ৩০ গ্রাম সাবান মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

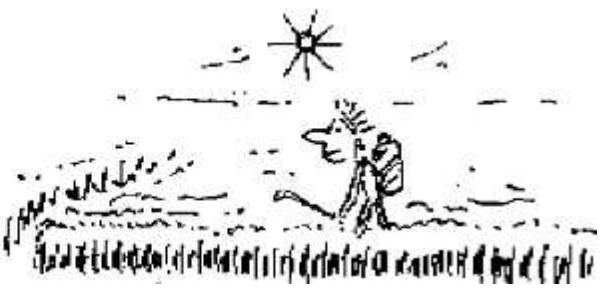

ট্রাইকোডারমা ভিরিডি

এটি গবেষণাগারে তৈরি একপ্রকার ছত্রাক, যেটি উদ্ভিদের জৈব রোগনাশক হিসেবে কাজ করতে পারে।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কার্যকরী :

- ফসলের ছত্রাকজনিত ঢলে পড়া রোগ, পাতায় মরচে ধরা রোগ, চারা গাছ শুকিয়ে ধ্বসা রোগ, শিকড় পচা রোগ, বৃন্ত ও কাণ্ড পচা রোগ দমনে ব্যবহার করা যায়।
- বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করে।
- উদ্ভিদের আংশিক পুষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করে।
- উদ্ভিদ ও প্রাণীর শারীরিক কোনো ক্ষতি করে না।

ব্যবহারের নিয়ম :

বীজ শোধন :

রাসায়নিক বিষ দিয়ে সংরক্ষিত বীজ পরিস্কার জলে ভাল করে ধুয়ে নিন। বীজের গায়ে বিষাক্ত কিছু না মাখানো থাকলে বীজ ধোওয়ার প্রয়োজন নেই।

- প্রতি কেজি বীজের জন্য ১০ গ্রাম টি.ভি. কালচার দরকার হয়। প্রয়োজন মতো ঠাণ্ডা ভাতের মাড় বা লেই এর সঙ্গে মিশিয়ে আঠালো দ্রবণ তৈরি করুন।

- ওই দ্রবণে বীজগুলি ভালোভাবে মাখিয়ে নিন।
- বীজগুলি ছায়াযুক্ত স্থানে হালকা শুকিয়ে নিন।
- শুকনো বীজ ওইদিন বিকালে বপণ করুন।

চারা শোধন :

- প্রতি লিটার জলে ২০ গ্রাম টিভি কালচার গুলে নিতে হবে।
- কালচার মিশ্রিত জলে বেগুন, লঙ্কা, টমেটো, কপি প্রভৃতি চারা গাছের শিকড় ৫ মিনিট ডুবিয়ে নিয়ে চারাগুলি রোপণ করুন।

বীজতলায় ব্যবহার

- প্রতিলিটার জলে কাঠা প্রতি ৫০ গ্রাম টিভি কালচার ৫০০ গ্রাম কেঁচোসার বা কম্পোস্টের সাথে মিশিয়ে বীজতলায় ছড়িয়ে দিন।

মূলজমিতে প্রয়োগ

বিঘাপ্রতি ৩০০ গ্রাম টি.ভি. কালচার ব্যবহার করুন। অন্যান্য জৈব সারের সাথে মিশিয়ে জমি তৈরির সময়ে উপরিতলের মাটিতে মিশিয়ে দিন।

ফসলে স্প্রে

লিটার প্রতি ১০ গ্রাম কালচার গুলে বিকালের দিকে ফসলের গা ও পাতায় স্প্রে করুন।

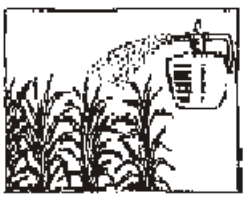

৫) তথ্যায়ন ও মূল্যায়ন

জৈব নিবিড় রোগপোকা নিয়ন্ত্রণের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ও কাজ সুন্দরভাবে লিখে রাখতে হবে। লিখিত তথ্য বিশ্লেষণ করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এই তথ্যের ভিত্তিকে ঠিক করতে হবে রোগপোকার জন্য আমরা কী ধরনের পদক্ষেপ নেব, কখন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, কখন প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতে হবে এবং কখন কিছু করবার দরকার নেই।

সুসংহত আগাছা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

১। পরিচর্যাগত নিয়ন্ত্রণ

ক। চাষের আগে ভালো ভাবে জমি তৈরি করা
খ। মাটিতে জীবন্ত ও মৃত আচ্ছাদন দেওয়া
গ। সঠিক শস্য পর্যায় মেনে চলা
ঘ। মিশ্র ও অন্তবর্তী ফসল চাষ করা
ঙ। আগাছা মুক্ত বীজও জৈব সার জমিতে ব্যবহার
চ। সেচ দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখা যাতে আগাছার বীজ জমিতে না চলে যায়
ছ। ফসল তোলার সময় যাতে আগাছার বীজ না মিশে থাকে

২। যান্ত্রিক পদ্ধতি

ক। জমি ভালো করে কর্ষণ করা
খ। জমিতে জল জমিয়ে রাখা
গ। নিয়মিত নিড়ানি দেওয়া
ঘ। ১০ ভাগ লবন জলের দ্রবণ আছাতে স্প্রে করা
ঙ। ফুল আসার আগে আগাছা নির্মূল করা

৩। জৈবিক আগাছা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

আগাছার প্রাকৃতিক শত্রু যেমন পোকা, প্রাণি বা উদ্ভিদ দ্বারা আগাছা নিয়ন্ত্রণকে জৈবিক নিয়ন্ত্রণ বলে।
ক। আগাছার প্রাকৃতিক শত্রু বেঁচে থাকার জন্য ও বংশবিস্তার করবার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা
খ। বাইরে থেকে আগাছার প্রাকৃতিক শত্রু এনে জমিতে ছাড়া ।

সুতরাং আগাছাকে ভয় না পেয়ে আগাছা থেকে যে ধরনের উপকার পাওয়া যায় সেইগুলি ব্যবহার করা এবং কৃষিতে সঠিক আগাছা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার।